Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহেলা শারমিন

রোলঃ 227020272

২৭ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহেলা শারমিন

রোলঃ 227020272

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শাহেলা শারমিন, আইডিঃ 227020272 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Shahela

(স্বাক্ষর)

শাহেলা শারমিন

আইডিঃ 227020272

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৭ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

■ রোজার ভূমিকা তাৎপর্য ইতিহাসঃ

রাসূল (সা.) বলেন, রোজাদারের জন্য দুইটি আনন্দময় মুহূর্ত রয়েছে ১. ইফতারের সময় ২. আখিরাতে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়’। (বুখারী ও মুসলিম)।

ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল ভিত্তির তৃতীয়টি হলো রোজা। ইসলামি বিধান অনুসারে- মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, স্থায়ী ও শারীরিক-মানসিকভাবে সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সিয়াম পালন বা রোজা রাখা ফরজ।

রোজা শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘বিরত থাকা’। আর আরবিতে এর নাম সাওম, বহুবচনে সিয়াম। যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্ব প্রকার পানাহার, কামাচার, পাপাচার এবং সেই সঙ্গে যাবতীয় ভোগ-বিলাস ও অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকার নাম রোজা।

রোজা শব্দটি ফার্সি ভাষা থেকে এসেছে। এর আরবি শব্দগুলো হল সাওম বা সিয়াম। যার অর্থ হলো কোন কাজ থেকে বিরত থাকা। রোজা থাকা মানে শুধু না খেয়ে থাকা নয়। রোজা হলো নিয়তের সঙ্গে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা। যুগে যুগে বিভিন্ন নবি-রাসূলদের জামানায় এ রোজা ফরজ ছিল।

মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) এর ওপর রোজার বিধান আরোপ করে মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম রোজার প্রচলন শুরু করেন। আমাদের পূর্ববর্তী সকল নবী ও উম্মতের উপরও রোজার বিধান আরোপ করা হয়েছিল।

উম্মতে মুহাম্মাদির ওপর এরই ধারাবাহিকতায় রোজা ফরজ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে ইমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন রোজা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ১৮৩)

হজরত আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আগমন করার পরে প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা রাখতেন। এটা শুকরিয়া হিসেবেও হতে পারে। আবার তাওবা হিসেবেও হতে পারে। চাঁদের হিসেবে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে এই রোজা রাখতেন। কারণ, এই দিনগুলোতে চাঁদ পূর্ণতা পায়।

বলা হয়, একবার তিনি পানিতে নিজের চেহারা দেখে বুঝতে পারেন যে জান্নাতের সৌন্দর্য ও লাবণ্য তিনি এখানে পাননি। তখন তিনি দুঃখিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ,

জান্নাতের পোশাকও আমার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আবার সৌন্দর্য ও লাবণ্যও দেওয়া হয়নি। তখন তাকে বলা হয়, তুমি মাসে তিনটি রোজা রাখো। তিনি এই রোজা রাখতে শুরু করেন, যার বদৌলতে আগের মতো জান্নাতি রূপ-লাবণ্য ও ঔজ্জ্বল্য ফিরে পান। অবশ্য আলোচ্য বক্তব্যের কোনও সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

যেভাবেই হোক, হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে রোজার ধারাবাহিকতা শুরু হয়।

তার পরবর্তী যুগে হজরত নূহ আলাইহিস সালাম এই রোজা রাখতেন। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামও রোজা রাখতেন। এ ব্যাপারে হাদিসে নববিতেও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পাওয়া যায়। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন তুর পাহাড়ে আল্লাহ তাআলার সাথে কথোপকথনে গমন করেন, তখন তিনি ৪০ দিন রোজা রাখেন। হজরত দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার রাজত্বও দিয়েছিলেন। আবার নবুয়তও দিয়েছিলেন। তিনি একদিন রোজা রাখতেন, একদিন ইফতার করতেন। বছরে ছয় মাস রোজা রাখতেন। হাদিসে নববিতে একে রোজা রাখার উত্তম পদ্ধতি বলা হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন :

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় রোজা হলো হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের নিয়মে রোজা পালন করা। তিনি একদিন সওম পালন করতেন, আরেক দিন বিরত থাকতেন। [সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৩১]

হজরত জাকারিয়া ও ইয়াহইয়া আলাইহিমাস সালামও রোজা রেখেছেন। হজরত ঈসা আলাইহিস সালামও দুই মাসের রোজা রাখতেন। হিন্দু ব্রাহ্মণরাও ৪০টি রোজা রাখেন। অতএব, বোঝা গেলো প্রত্যেক ধর্মে Fasting (রোজা) ইবাদত রয়েছে। ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায় Fasting (রোজা) শিরোনামের অধীনে লেখা হয়েছে, ‘আমরা দুনিয়ার এমন কোনও ধর্ম পাইনি, যে ধর্মে রোজার ইবাদত নেই।’

আশুরার রোজা: হিজরত করে মদিনায় আসার কিছু দিন পর থেকেই মুসলিমরা আশুরার রোজা পালন করতে শুরু করেন। এই সময় আশুরার রোজাই তাদের ওপর ওয়াজিব ছিল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আসেন তখন দেখতে পান, ইহুদিরা আশুরার দিন রোজা রাখে। তাদের রোজা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো, এই দিনেই

আল্লাহ তাআলা মুসা ও বনি ইসরাইলকে ফিরাউনের ওপর বিজয় দিয়েছিলেন। তাই আমরা ওই দিনের সম্মানে রোজা পালন করি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের চেয়ে আমরা মুসা আলাইহিস সালামের বেশি নিকটবর্তী। এরপর তিনি সবাইকে রোজা পালনের নির্দেশ দেন। [সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৯৪৩]

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন :

জাহেলি যুগে কুরাইশরা আশুরার রোজা পালন করতো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই রোজা পালন করতেন। যখন তিনি মদিনায় আগমন করেন তখনও এই রোজা পালন করেন এবং তা পালনের নির্দেশ দেন। যখন রমজানের রোজা ফরজ করা হলো তখন আশুরার রোজা ছেড়ে দেওয়া হয়। যার ইচ্ছা সে পালন করবে আর যার ইচ্ছা পালন করবে না। [সহিহ বুখারি, হাদিস : ২০০২]

বেশিরভাগ ফকিহ ও মুহাদ্দিসের মতে, রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার আগে আশুরার রোজা ওয়াজিব ছিল, যা পরবর্তী সময়ে নফলে পরিণত হয়। আর প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখার বিধান সবসময় মুস্তাহাব ছিল।

রমজানের রোজা: দ্বিতীয় হিজরিতে রমজানের রোজা ফরজ হয়। এই হিসাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট ৯ বছর রমজানের রোজা পালন করেছেন। [আল-মাজমুআ: ৬/২৫০]

প্রথমে ইচ্ছাধিকার ছিল: রমজানের রোজা যখন প্রথম ফরজ হয়, তখন রোজা রাখা ও ফিদিয়া দেওয়ার ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয়।

এরশাদ হচ্ছে:

(তোমাদের ফরজ করা হয়েছে) রোজা নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। এটা যাদের মারাত্মক কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য হলো, এর পরিবর্তে ফিদিয়া—একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। অবশ্য রোজা পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। [সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৪]

ফরজ বিধান : এরপর কোনও প্রকার অবকাশ না রেখেই রোজা ফরজ করা হয়।

এরশাদ হচ্ছে :

রমজান মাস। এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে রোজা পালন করে। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫]

সময় রদবদল : রমজানের রোজা যখন ফরজ হয়, তখন কেবল রাতের বেলা এশার নামাজ বা ঘুমের আগ পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাসের সুযোগ ছিল। এশার নামাজ বা ঘুমের পর পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ হয়ে যেতো। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা সময় সংক্ষিপ্ত করে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজার সময় নির্ধারণ করেন। এরশাদ হচ্ছে :

রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানেন যে তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সঙ্গে সংগত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা করো। আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণরেখা থেকে ঊষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতিভাত না হয়। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭]

এভাবেই ধারাবাহিকভাবে রোজা ফরজ হয়।

■ রোযার প্রকারসমূহঃ

রোযা ছয় প্রকার। ১. ফরয। ২. ওয়াজিব। ৩. সুন্নাত। ৪. মোস্তাহাব। ৫. মাকরূহ। ৬. হারাম।

প্রথম প্রকার: ফরয রোযা। তাহলো রযমান মাসের রোযা।

দ্বিতীয় প্রকার: ওয়াজিব রোযা। যথা (ক) নফল রোযার কাযা, যা শুরু করে নষ্ট করে দিয়েছে। (খ) মান্নতের রোযা। (গ) কাফফারার রোযা। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে কাফফারার রোযা আবশ্যক হবে।

(ক) রমযান মাসে কোন ওজর ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা নষ্ট করা। (খ) রমযানের দিবসে ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করা। (গ) স্ত্রীর সঙ্গে জেহার' করা।

(ঘ) কসম ভঙ্গ করা। (চ) ইহরামের অবস্থায় ইহরামের পরিপন্থী কাজ করা। (ছ) ভুলবশত কাউকে হত্যা করা। তদ্রূপ যা ভুলবশত হত্যার পর্যায় ভুক্ত (কাজ করা)।

তৃতীয় প্রকার: তা হল সুন্নাত রোযা। যথা নয় তারিখ কিংবা এগার তারিখ সহকারে আশুরার দিনের রোযা।

চতুর্থ প্রকার: মোস্তাহাব রোযা। যথা (ক) প্রতিমাসে যে কোন দিন তিনটি রোযা রাখা। (খ) প্রতি মাসে আইয়ামে বীয তথা তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখা। (গ) প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহঃবার রোযা রাখা। (ঘ) শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখা। (ঙ) হাজীগণ ব্যতীত অন্যান্যদের আরাফার দিন রোযা রাখা। (চ) হযরত দাউদ (আঃ) এর ন্যায় রোযা রাখা। অর্থাৎ একদিন বাদ দিয়ে একদিন রোযা রাখা। এ ধরনের রোযা রাখা উত্তম এবং আল্লাহ তায়ালার নকট

অধিক পছন্দনীয়। পঞ্চম প্রকার: মাকরূহ রোযা। যথা (ক) আশুরার দিন শুধু একটি রোযা রাখা। (খ) শুধু শনিবার দিন রোযা রাখা। (গ) বিরতীহীন ভাবে রোযা রাখা। অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর পানাহার না করে আগামী দিনের রোযা গত কালের রোযার সাথে যুক্ত করে দেওয়া।

ষষ্ঠ প্রকার: হারাম রোযা। যথা (ক) ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা। (খ) কোরবানীর ঈদের দিন রোযা রাখা। (গ) আয়্যামে তাস্রীক তথা জিলহজ্বের এগার, বার ও তের তারিখ রোযা রাখা।

■ রোযার উদ্দেশ্যঃ

রোজা রাখার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা, পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং নিজেদের কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরহেজগারি বা তাকওয়া বৃদ্ধি করা।

ইসলামের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে

সিয়াম বা রোজা অন্যতম একটি স্তম্ভ।

হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা রোজার প্রতিদান নিজ হাতে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

কোরআনে বলা হয়েছে,

পবিত্র কোরআনুল কারিমে মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন,

সূরা বাকারহ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِين َآمَنُوا كُتِب َعَلَيْكُم ُالصِّيَام ُكَمَا كُتِب َعَلَى الَّذِين َمِن ْقَبْلِكُم ْلَعَلَّكُم ْ تَتَّقُوْن.َ

হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। (সূরা বাকারহ- আয়াতঃ ১৮৩)

أَيَّامًا مَّعْدُودَة ٍفَمَن ْكَان َمِنْكُم ْمَّرِيضًا أَو ْعَلَى سَفَر ٍفَعِدَّة ٌمِن ْأَيَّام ٍأُخَر َ وَعَلَى الَّذِين َيُطِيقُونَه ُفِدْيَة ٌطَعَام ُمِسْكِين ٍفَمَن ْتَطَوَّع َخَيْرًا فَهُو َخَيْر ٌلَه ُ وَأَن ْتَصُوْمُوا خَيْر ٌلَكُم ْإِن ْكُنْتُم ْتَعْلَمُون.َ

নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদয়া- একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা। অতএব যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান। (সূরা বাকারহ- আয়াতঃ ১৮৪)

شَهْر ُرَمَضَان َالَّذِي أُنْزِل َفِيْه ِالْقُرْآن ُهُدًى لِلنَّاس ِوَبَيِّنَت ٍمِن َالْهُدَى وَالْفُرْقَان ِ فَمَن ْشَهِد َمِنْكُم ُالشَّهْر َفَلْيَصُمْه ُو َمَن ْكَان َمَرِيضًا أَو ْعَلَى سَفَر ٍفَعِدَّة ٌ مِن ْأَيَّام ٍأُخَر َيُرِيد ُاللَّه ُبِكُم ُز الْيُسْر َوَلَا يُرِيد ُبِكُم ُالْعُسْر َوَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّة َ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّه َعَلَى مَا هَدَيكُم ْوَلَعَلَّكُم ْتَشْكُرُون.َ

রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর।

(সূরা বাকারহ- আয়াতঃ ১৮৫)

وَإِذَا سَأَلَك َعِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب ٌأُجِيب ُدَعْوَة َالدَّاع ِإِذَا لا دَعَان ِفَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم ْيَرْشُدُون.َ

আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে।

সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে।

(সূরা বাকারহ- আয়াতঃ ১৮৬)

أُحِل لَكُم لَيْلَة الصِّيَام الرَّفَث إِلَى نِسَائِكُم هُن لِبَاس لَكُم و أَنْتُم لِبَاس
لَهُن عَلِم اللَّه أَنَّكُم كُنْتُم تَخْتَانُون أَنْفُسَكُم فَتَاب ج عَلَيْكُم وَعَفَا عَنْكُم
فَالْئُن بَاشِرُوهُن وَابْتَغُوْا مَا كَتَب اللَّه لَكُم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُم
الْخَيْط الْأَبْيَض مِن ج الْخَيْط الْأَسْوَد مِن الْفَجْر ثُم أَتِبُوا الصِّيَام إِلَى الَّيْل
وَلَا تُبَاشِرُوهُن وَأَنْتُم عَلِفُوْن فِي الْمَسْجِد تِلْك حُدُود اللَّه فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِك
يُبَيِّن اللَّه أَيْتِه لِلنَّاس لَعَلَّهُم يَتَّقُوْن.

সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান কর। আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মাসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

(সূরা বাকারহ- আয়াতঃ ১৮৬)

তিনি বললেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ; তবে তুমি যদি কিছু নফল আদায় কর তবে তা স্বতন্ত্র।'

তারপর সে ব্যক্তি বলল, আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কত সিয়াম ফরজ করেছেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'রমজান মাসের সাওম বা রোজা; তবে তুমি যদি কিছু নফল রোজা আদায় কর তবে তা স্বতন্ত্র কথা।'

তারপর তিনি বললেন, বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কী পরিমাণ জাকাত ফরজ করেছেন?

রাবি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের বিধান জানিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, 'ওই সত্ত্বার কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী করে সম্মানিত করেছেন।

(লোকটি বলল) আল্লাহ আমার ওপর যা ফরজ করেছেন, আমি এর মাঝে কিছু বাড়াবো না এবং কমাবোও না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করবে কিংবা বলেছেন, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাত লাভ করবে।' (বুখারী)।

পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী রমজান মাসব্যাপী রোজা পালন করা আল্লাহর বিধান ও ফরজ তথা আবশ্যক ইবাদত। যারা এ ইবাদত যথাযথ পালন করবে, তাদের জন্য পরকালের সফলতা তথা জান্নাত লাভ সুনিশ্চিত।

সাওম বা রোজা পৃথিবীর প্রথম নবী হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হয়ে আসছে। যার ক্রমধারা আমাদের প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে বর্তমান সময় পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা যতসব ইবাদত তাঁর মু'মিন বান্দাদের ওপর ফরজ করেছেন, এর পেছনে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। এ হিসেবে মু'মিনদের ওপর রোজা ফরজ করার পেছনেও রয়েছে আল্লাহর মহান উদ্দেশ্য।

১. তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত করা : রোজার প্রধান উদ্দেশ্য মু'মিনদেরকে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতির গুণে গুণান্বিত করা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 'হে ঈমানদাররা! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে। যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে সক্ষম হও।' (সূরা আল বাকারা-১৮৩) এ আয়াতে রোজা ফরজ করার উদ্দেশ্য বলা হয়েছে তাকওয়া অর্জন। তাকওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ সতর্ক হওয়া, ভয় করা, সংযত হওয়া, বেঁচে থাকা, শক্তি সঞ্চয় করা, দায়িত্বশীল হওয়া, জবাবদিহিতার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করা। পরিভাষায় তাকওয়া বলা হয় সতর্ক ও সচেতনতার সাথে পরকালে আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাবদিহিতার মনোভাব নিয়ে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে সব কাজ সম্পাদন করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির পরিপন্থী সব কাজ বর্জন করা।

তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য হলো ছয়টি। যেমন- ১. সত্যের সন্ধান; ২. সত্য গ্রহণ; ৩. সত্যের ওপর অটল থাকা; ৪. আল্লাহভীতি; ৫. দায়িত্বানুভূতি; ৬. জবাবদিহিভিত্তিক দায়িত্বশীলতার সাথে কর্তব্য সম্পাদন।

২. জৈবিক চাহিদা থেকে আত্মাকে মুক্ত রাখা : জৈবিক চাহিদা মানবের সবচেয়ে ক্ষতিকর জিনিস। এর থেকে আত্মাকে মুক্ত রাখা রোজার অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, সিয়ামের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার পাশবিক বাসনা ও জৈবিক চাহিদা থেকে মুক্ত রাখা, সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জন করে চিরন্তন জীবনের অনন্ত সফলতার শৈলচূড়ায় আরোহণ করে। পশুত্ব নিস্তেজ হয়ে মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়। সিয়াম দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক সৃষ্টি করে মানুষের শারীরিক ও আত্মিক শক্তির উন্নতি সাধন করে এবং পাশবিক চাহিদা যা মানুষের স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে তা থেকে মুক্ত করে। অনুরূপ রোজা কলবের ইসলাহ ও চরিত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে (জাদুলমাআদ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫২) শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী রহ: হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থে বলেছেন, রোজার উদ্দেশ্য হলো মানুষ থেকে পশু স্বভাব দূর করা। পশু স্বভাব মানুষের জন্য বিরাট ক্ষতিকর। তাই মহানবী সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অর্থাভাবে বিয়ে করতে অক্ষম সে যেন সিয়াম পালন করে। কারণ, সিয়াম পালনের ফলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে এবং বিয়ে করার কামনা দূর হবে।' (মিশকাত বিয়ে পর্ব, পৃষ্ঠা- ২৬৭)

৩. আত্মিক ও দৈহিক ফায়দা : দৈহিক উৎকর্ষ সাধনে রোজার ভূমিকা অন্যতম। সিয়াম সাধনায় যেমন আত্মিক পরিচ্ছন্নতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে দৈহিক সুস্থতা। অধ্যক্ষ ডাক্তার বি সি গুপ্ত বলেছেন, ইসলাম সিয়াম সাধনার যে বৈজ্ঞানিক নির্দেশ দিয়েছে, তা যে মানুষের দৈহিক ও আত্মিক মঙ্গল সাধনে সক্ষম, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ডাক্তার আর ক্যামবারড বলেছেন, সিয়াম পরিপক্ক শক্তির সহায়ক। ডক্টর এমারসন বলেন, যদি কারো স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য উপবাসের প্রয়োজন হয়, তবে সে যেন ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী রোজা পালন করে। অতএব এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, সিয়াম সাধনায় অর্জিত হয় দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার ফায়দা।

৪. ধৈর্য ও সহানুভূতির শিক্ষা দান : সিয়াম সাধনায় রয়েছে সিয়াম পালনকারীর জন্য ধৈর্য ও সহানুভূতির শিক্ষা। রোজা পালনের ফলে আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রোজাদারের দৈহিক, আত্মিক ও মানসিক অবস্থা পরিশুদ্ধ হয়। নিজে জঠরজ্বালা সহ্য করে এবং সমাজের গরিব-দুঃখী, ফকির-মিসকিন, যারা উপবাসে দিন কাটায়, তাদের অবস্থা অনুভব করে। তাই রমজান মাসকে বলা হয় ধৈর্য ও সহমর্মীর মাস।

৫. রিপগুলো দমন করা : সিয়াম সাধনা রিপুগুলো দমন করে এবং আত্মার লালসা দূরীভূত করে মু'মিনের দেহ ও মনে পরিচ্ছন্নতা আনয়ন করে। ফলে সিয়াম সাধনা আত্মশুদ্ধির অন্যতম সুযোগ। সিয়াম রিপুগুলো পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে মুত্তাকি হওয়ার পরম সুযোগ করে দেয়। সিয়াম সাধনা অনর্থক কাজ, মিথ্যা বচন, প্রবঞ্চনা, পরনিন্দা, অশ্লীলতা, অসৎকর্ম, কর্কশবাক্য ব্যবহার ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখে। মহানবী সা: বলেন, পাঁচটি জিনিসকে সিয়াম নষ্ট করে দেয়। তা হলো- মিথ্যা কথা, পরনিন্দা, কূটনামি, মিথ্যা শপথ ও কামভাবে দৃষ্টিপাত। মহানবী সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা কাজ করা ছাড়তে পারল না, তার পানাহার ত্যাগ তথা রোজা রাখা আল্লাহর কোনোই প্রয়োজন নেই।' (বুখারি-১৭৭০)

৬. আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা : সিয়াম সাধনা মানুষকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করে। ইমাম গাজ্জালি রহ: 'ইয়াহইয়াউল উলুম' গ্রন্থে বলেছেন, আখলাকে ইলাহির গুণে মানুষকে গুণান্বিত করে তোলাই সিয়ামের অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা পানাহার করেন না। রোজাদার পানাহার বর্জনের ফলে আখলাকে ইলাহির গুণে গুণান্বিত হয়।

৭. ফেরেশতার গুণে গুণান্বিত করা : সিয়াম সাধনার মাধ্যমে রোজাদার ফেরেশতার গুণে গুণান্বিত হয়। ফেরেশতারা যেমন পানাহার করে না, রোজাদারও পানাহার করে না। ফলে পানাহার ও কামাচার বর্জনের দিক দিয়ে ফেরেশতা ও রোজাদার সমগুণে গুণান্বিত হয়। রোজাদারদের মর্যাদা এই যে, তার মুখের গন্ধ আল্লাহ তায়ালার কাছে মৃগনাভির সুঘ্রাণের চেয়েও অধিক সুঘ্রাণ (মুসলিম-১৯৪৫)

৮. নফসকে বিবেকের শাসন মানতে বাধ্য করা : মানবদেহের মূল অঙ্গ হলো নফস বা আত্মা। এই আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং মন্দ চিন্তা থেকে মুক্ত রাখার একমাত্র পন্থা হলো রোজা রাখা। নফস বা প্রবৃত্তিকে বিবেকের শাসন মানতে অভ্যস্ত করে তোলাই রোজার বিশেষ উদ্দেশ্য। প্রবৃত্তি ও বিবেক এই দুয়ের জয়-পরাজয় নিয়েই মানুষের মধ্যে পশুত্ব ও সততার জয়-পরাজয় সূচিত হয়ে থাকে। আর সিয়াম পালনের মাধ্যমেই ব্যক্তি পশুত্বের ওপর সততা ও অন্যায়ের ওপর ন্যায় বিজয়ী হয়। অন্য কোনো ইবাদতে তা সম্ভব নয়।

৯. পাপমুক্ত রাখা : সিয়াম সাধনা নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। হজরত জিবরাঈল আ: দোয়া করেছেন, আর মহানবী সা: আমিন বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রমজান মাস পেল অথচ গুনাহগুলো মাফ করিয়ে নিতে পারল না, সে ধ্বংস হোক (আদারুল মুদরাবাদ, ইমাম বুখারি) এ দোয়া কখনো বিফলে যাবে না। এ মাসের প্রতিটি মুহূর্তে

দোয়া কবুল হয়। বিশেষ করে ইফতারের সময়, শেষ রাতে, কদরের রাতে, জুমার দিনে। এ মাসের দানে ৭০০ গুণ সওয়াব পাওয়া যায়। একটি নফল আদায় করলে ফরজের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা নিজে সিয়াম পালনকারীর প্রতিদান দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। (মুসলিম-১৯৪৫) জান্নাতের একটি দরজার নাম রাইয়ান, যা দিয়ে শুধু রোজাদাররাই প্রবেশ করবেন। এ মাসের প্রথম ১০ দিন রহমতের, মধ্য ১০ দিন মাগফিরাতের এবং শেষ ১০ দিন নাজাতের। অতএব, সব দিক বিবেচনা করলে স্পষ্ট হয়, নিজেকে পাপমুক্ত রাখার এবং অধিক পুণ্য লাভের মুখ্য সময় হলো এ মাহে রমজান।

১০. অনুপম ইবাদত : রোজা একটি অনুপম ইবাদত। তা দীর্ঘ সময় ধরে পালন করতে হয়। এ মাসে কুরআনসহ সব আসমানি গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, সব উম্মতের ওপর তা ফরজ এবং তা লৌকিকতামুক্ত ইবাদত।

- **রোজার ফজিলতসমূহঃ**

রমজানের একটি বিশেষ ফজিলত বা মাহাত্ম হচ্ছে, এই পবিত্র রমজান মাসে আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। রমজান মাসের রোজা মানুষকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি দেয়, মানুষের কুপ্রবৃত্তি ধুয়ে মুছে দেয় এবং আত্মাকে দহন করে ঈমানের শাখা প্রশাখা সঞ্জিবীত করে। সর্বোপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। এই মর্মে মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন,

‘রোজাদারের জন্য দু’টি খুশি। একটি হলো তার ইফতারের সময়, আর অপরটি হলো আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়।’ (বুখারী ও মুসলিম)।

হাদিসে পাকে রমজানের রোজার আবশ্যকতা তুলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন-

হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, (একবার) এলোমেলো চুলসহ এক গ্রাম্য আরব প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। অতঃপর বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বলুন, আল্লাহ তায়ালা আমার ওপর কত রাকাত নামাজ ফরজ করেছেন?

তিনি বললেন, ‘পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ; তবে তুমি যদি কিছু নফল আদায় কর তবে তা স্বতন্ত্র।’

তারপর সে ব্যক্তি বলল, আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কত সিয়াম ফরজ করেছেন?
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'রমজান মাসের সাওম বা রোজা; তবে তুমি যদি কিছু নফল রোজা আদায় কর তবে তা স্বতন্ত্র কথা।'
তারপর তিনি বললেন, বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কী পরিমাণ জাকাত ফরজ করেছেন?
রাবি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের বিধান জানিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, 'ওই সত্ত্বার কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী করে সম্মানিত করেছেন।
(লোকটি বলল) আল্লাহ আমার ওপর যা ফরজ করেছেন, আমি এর মাঝে কিছু বাড়াবো না এবং কমাবোও না।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করবে কিংবা বলেছেন, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাত লাভ করবে।' (বুখারী)।
পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী রমজান মাসব্যাপী রোজা পালন করা আল্লাহর বিধান ও ফরজ তথা আবশ্যক ইবাদত। যারা এ ইবাদত যথাযথ পালন করবে, তাদের জন্য পরকালের সফলতা তথা জান্নাত লাভ সুনিশ্চিত।
সাওম বা রোজা পৃথিবীর প্রথম নবী হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হয়ে আসছে। যার ক্রমধারা আমাদের প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে বর্তমান সময় পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই দশগুণ থেকে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করা হয়। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, কিন্তু রোজা ছাড়া। কেননা তা আমার জন্য, তাই আমি এর প্রতিদান দেবো। সে আমার সন্তুষ্টির জন্য কামাচার ও পানাহার পরিত্যাগ করে। রোজা পালনকারীর জন্য রয়েছে দুটি খুশী যা তাঁকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশী হয় এবং যখন সে তাঁর রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন রোজার বিনিময়ে আনন্দিত হবে। রোজা পালনকারীর মুখের (না খাওয়াজনিত) ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে মিসকের ঘ্রাণের চেয়েও উত্তম।' (বুখারি ১৯০৪, মুসলিম ১১৫১)
অন্য বর্ণনায় এসেছে,

لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

‘প্রত্যেক আমলেরই কাফফারা আছে। রোজা আমার জন্য, তাই আমি এর প্রতিদান দেবো।’ (বুখারি ৭৫৩৮, মুসনাদে আহমাদ ১০৫৫৪)

হাদিসের বর্ণনায় রোজাকে অন্যান্য আমলের বর্ধিত সওয়াব থেকে আলাদা করা হয়েছে। অন্যান্য আমলের সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ করার কথা বলা হলেও রোজার ব্যাপারটি আলাদা। কেননা এর সওয়াব সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহ তাআলা রোজার সওয়াব বহু গুণে দান করবেন। কেননা রোজা সবর তথা ধৈর্য থেকে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

‘কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে, কোনো হিসাব ছাড়াই।’ (সুরা যুমার: আয়াত ১০)

ধৈর্য তিন ধরনের। এ তিন ধরণের ধৈর্য রোজার মধ্যে একত্রিত হয়। আল্লাহর আনুগত্যের ওপর ধৈর্যধারণ করা, আল্লাহর হারাম জিনিস থেকে বিরত থাকতে ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহর ফয়সালাকৃত কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

وَهُو شَهْر الصَّبْر ، وَالصَّبْر ثَوَابُه الْجَنَّةُ

‘রমযান মাস ধৈর্যের মাস। আর ধৈর্যের প্রতিদান জান্নাত।’ (ইবন খুযাইমা ১৮৮৭)

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

الصِّيَام جُنَّة ، وَإِذَا كَان يَوْم صَوْم أَحَدِكُم فَلا يَرْفُث وَلا يَصْخَب ، فَإِن سَابَّه أَحَد أَو قَاتَلَه ، فَلْيَقُل إِنِّي امْرُؤ صَائِمٌ

‘ রোজা ঢালস্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন রোজা পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। কেউ যদি তাঁকে গালি দেয় অথবা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোজা পালনকারী।’ (বুখারি ১৯০৪, মুসলিম ১১৫১)

হজরত আবু উবাইদাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন-

الصَّوْم جُنَّة مَا لَم يَخْرِقْهَا

‘রোজা ঢালস্বরুপ যতক্ষণ পর্যন্ত তা ভেঙ্গে না ফেলে।’ (নাসাঈ ২২৩৫, মুসনাদে আহমাদ ১৬৯০)

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

ثَلَاثَة لَا تُرَد دَعْوَتُهُم : الصَّائِم حَتَّى يُفْطِرَ

'তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। রোজা পালনকারী যতক্ষণ না ইফতার করে।' (তিরমিজি ৩৪৯৮)
রোজা পালনকারী যদি রাতে নামাজ আদায় করে এবং দিনের বেলায় রোজা পালনের উদ্দেশ্যে শরীরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য পানাহার করে তাহলে তা তার জন্য সাওয়াব হিসেবে ধর্তব্য হবে যেমনিভাবে সে রাতে ও দিনে কাজের জন্য শক্তি বৃদ্ধি করতে ঘুমালে সেটি তার জন্য ইবাদত হবে।
হজরত আবু আলিয়াহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, রোজা পালনকারী গিবত না করা পর্যন্ত ইবাদতে থাকে, যদিও সে বিছানায় ঘুমায়। অতএব, রোজাদার রাত-দিন সব সময়ই ইবাদতে থাকে এবং রোজা অবস্থায় ও ইফতারির সময় তার দোয়া কবুল করা হয়। সে দিনের বেলায় রোজা পালনকারী ও ধৈর্যশীল এবং রাতের বেলায় আহার গ্রহণকারী ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায়কারী। ইমাম তিরমিজি ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেন-
الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ
'আল্লাহর শুকরিয়া আদায়কারী, আহারকারীর মর্যাদা হলো ধৈর্যশীল রোজা পালনকারীর মতো।' (তিরমিজি ২৪৮৬)
১. যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পানাহার ও কামভাব ত্যাগ করেছে বিনিময়ে জান্নাত পাওয়ার আশায়। এ শ্রেণির লোকেরা আল্লাহর সঙ্গে ব্যবসা করেছে। আর যারা উত্তম কাজ করেন তাদের প্রতিদান আল্লাহ নষ্ট করেন না। যারা আল্লাহর সঙ্গে ব্যবসা করবে তারা বিফল হবে না, বরং তারা বিরাট লাভবান হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-
إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْه
'আল্লাহর তাকওয়ার উদ্দেশ্যে যা কিছুই তুমি পরিহার করো, তিনি তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবেন।' (মুসনাদে আহমাদ ২০৭৩৯)
এসব রোজা পালনকারীকে জান্নাতে তাদের ইচ্ছামত খাদ্য, পানীয় ও নারী দান করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-
كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ
'(তাদেরকে বলা হবে) বিগত দিনসমূহে তোমরা যা আগে প্রেরণ করেছ তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান করো।' (সুরা হাক্কাহ: আয়াত ২৪)
হজরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, এ আয়াতটি রোজা পালনকারীদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে।

হজরত ইয়াকুব ইবন ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিনে তার অলিদের (বন্ধুদের) বলবেন, হে আমার বন্ধুগণ! আমি যখনই তোমাদের দিকে তাকাতাম তখনই তোমাদের ঠোঁট খাদ্যাভাবে শুষ্ক (কুঁচকানো) দেখতাম, তোমাদের চোখ বিনিদ্র দেখতাম, পেট ক্ষুধায় কাঁপত, আজকের দিনে তোমরা তোমাদের নেয়ামতে থাকো, তোমরা পরস্পরে পেয়ালা ভরা শরাব পান করো, তোমরা তোমাদের জন্য যা আগে প্রেরণ করেছ তার বিনিময়ে তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান করো।

হজরত হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নারী হুর মধুর নদীতে তার সঙ্গে হেলান দিয়ে বসা আল্লাহর বন্ধুকে বলবেন, তুমি পান পেয়ালার পানীয় গ্রহণ করো। আল্লাহ তোমার প্রতি কঠিন গরমের দিনে তাকাতেন, তুমি প্রচণ্ড তৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও পিপাসিত ছিলে। তখন আল্লাহ তোমাকে নিয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে গর্ববোধ করতেন। তিনি বলতেন, হে ফেরেশতাগণ! তোমরা আমার বান্দাকে দেখো, সে তার স্ত্রী, কামভাব, খাদ্য ও পানীয় আমার সন্তুষ্টির জন্য আমার কাছে যা কিছু আছে তার বিনিময়ে ত্যাগ করেছে। তোমরা সাক্ষ্য থাকো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তিনি সেদিনই তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِن فِي الجَنَّة بَابًا يُقَال لَه الرَّيَّان، يَدْخُل مِنْه الصَّائِمُون يَوْم القِيَامَة، لا يَدْخُل مِنْه أَحَد غَيْرُهُم، يُقَال: أَيْن الصَّائِمُون؟ فَيَقُومُون لا يَدْخُل مِنْه أَحَد غَيْرُهُم، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِق فَلَم يَدْخُل مِنْه أَحَدٌ

‘জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কেয়ামতের দিন রোজা পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাঁদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, রোজা পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তাঁরা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাঁদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।’ (বুখারি ১৮৯৬)

রমজান মাসে রোজা পালনকারীদের জান্নাতে বিয়ে দেওয়া হয়। জান্নাতের হুরদের মহর হলো দীর্ঘ সময় ধরে তাহাজ্জুদের নামাজ। আর এ নামাজ রমজান মাসে অধিক হারে আদায় করা হয়।

২. কিছু রোজা পালনকারী দুনিয়াতে আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকেই রোজা পালন তথা বিরত থাকে। তারা তাদের মস্তিষ্ক ও এর চিন্তাধারাকে হেফাজত করে, পেট ও পেটে

যা কিছু ধরে সবকিছু সংরক্ষণ করে, মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী পরীক্ষাকে স্মরণ করে, তারা আখেরাত কামনা করে এবং দুনিয়ার সমস্ত চাকচিক্য বর্জন করে। এ ধরণের লোকদের ঈদুল ফিতর হবে তাদের রবের সাথে সাক্ষাতের দিন। তাঁকে দেখা হবে তাদের আনন্দ-উল্লাস।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

ولَخُلُوف ُفَم ِالصَّائِم ِأَطْيَب ُعِنْد َاللَّه ِمِن ْرِيح ِالمِسْكِ

'রোজা পালনকারীর মুখের (না খাওয়াজনিত) ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে মিসকের ঘ্রাণের চেয়েও উত্তম।' (বুখারি ১৯০৪, সহীহ মুসলিম ১১৫১)

হজরত মাকহূল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জান্নাতিগণ জান্নাতে সুঘ্রাণ পাবে। তখন তারা বলবেন, হে আমাদের রব! জান্নাতে প্রবেশের পর থেকে এত সুন্দর সুঘ্রাণ আর কখনও পাইনি। তখন তাদেরকে বলা হবে- এ হলো রোজা পালনকারীদের মুখের সুঘ্রাণ।

রোযার সবচেয়ে বড় ফজিলত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করা এবং আওন প্রতিপালকের জন্য নিজের মানবিক চাহিদা বিসর্জন দিয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও তাকওয়ার অনুশীলন করা।

বান্দার এই অনুশীলনকে যথার্থ ও তার সংযমকে সার্থক করার জন্য প্রয়োজন গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে আগ্রহের সঙ্গে হক আদায় করে রোযা রাখা। এভাবেই রোযার ফজিলত ও উপকরণসমূহ পাওয়ার আশা করা যায়।নিম্নে রোযার কয়েকটি ফজিলত উল্লেখ হলো-

রোযার প্রতিদান আল্লাহ নিজেই দেবেন 💚-

প্রত্যেক নেক আমলের নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা আমলকারীকে পুরষ্কৃত করবেন। কিন্তু রোযার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা।কারন রোযার বিষয়ে আছে, আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে এক অনন্য ঘোষণা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ গুন থেকে সাতশ গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, কিন্তু রোযার বিষয়টি আলাদা।কেননা তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। বান্দা

তো আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পানাহার পরিত্যাগ করে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১১৫১ (১৬৪)]

অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন,' প্রত্যেক ইবাদতই ইবাদতকারীর জন্য, আর রোযা আমার জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। [সহীহ বুখারী,হাদিস: ১০৯৪]

সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, মহান আল্লাহ তায়ালা নিজেই যখন এর পুরষ্কার দেবেন, তখন কি পরিমান দেবেন?? ইমাম আওযায়ী রাহ, এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ রোযাদারকে যে প্রতিদান দেবেন, তা মাপা হবে না, ওজন করা হবে না অর্থাৎ বিনা হিসাবেই দেবেন।

রোযাদারকে আল্লাহ তায়ালা পানি পান করাবেন -

হযরত আবু মুসা আশআরী রা. হতে বর্ণিত,

" নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের ওপর অবধারিত করে নিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির জন্য গরমের দিনে (রোযার কারনে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিবসে (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন। [মুসনাদে বাযযার,হাদিস: ১০৩৯; মাযমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস: ৫০৯৫]

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাময়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

আল্লাহ তায়ালা বলেন, রোযা আমার জন্য।আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।কিয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য এক বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোযাদারগন ব্যতীত অন্য কারো আগমন ঘটবে না।[মুসনাদে বাযযার,,হাদীস:৮১১৫ মাযমাউয যাওয়ায়েদ. হাদীস: ৫০৯৩]

রোযা হল জান্নাত লাভের পথ -

হযরত আবুবু উমামা রা. বলেছেন,

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললাম, " ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার মাধ্যমে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। " উত্তরে তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখো,কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। অত:পর আমি পুনরায় তার কাছে এসে একই কথা বললাম।এবারও তিনি বললেন, রোযা রাখো।[মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ২২১৪৯ সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস: ১৮৯৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস:৩৫২৬]

রোযাদার 'রাইয়ান' গেট দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে💜-

হযরত সাহল ইবনে সাদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ইরশাদ করেছেন,

"জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান।কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে শুধু রোযাদারই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষনা করা হবে- কোথায় রোযাদারগন? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অত:পর রোযাদারগন যখন প্রবেশ করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। [সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৮৯৬;সহীহ মুসলিম, হাদীস:১১৫২]

রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দূর্গ 💜-

হযরত জাবিরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাদের মহান রব ইরশাদ করেছেন- রোযা হল ঢাল। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।রোযা আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দিব।[মুসনাদে আহমদ,হাদীস: ১৪৬৬৮: সহীহ ইবনে খুযাইমা,হাদীস: ২১২৫; সহীহ ইবনে হিব্বান,হাদীস:৩৬৪৯, সুনানে ইবনে মাজাহ,হাদীস: ১৬৩৯]

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

রোযা হল ঢাল এবং (জাহান্নাম থেকে পরিত্রান লাভের) সুরক্ষিত দুর্গ। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ৯২২৫; শুয়াবুল ঈমান, বাইহাকী, হাদীস: ৩৫৭১]

রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে 💜 -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, " অর্থাৎ রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব, তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন, অত:পর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।[মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ৬৬২৬, মুসতাদরাকে হাকীম,হাদীস: ২০৮০]

রোযাদারের গুনাহ মাফ হয়ে যায়💜-

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ইরশাদ করেছেন,

" যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৮, সহীহ মুসলিম ৭৬০]

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. বর্ণিত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন। আর আমি কিয়ামে রমাযান (অর্থাৎ তারাবী'র নামাজকে) সুন্নৎ করেছি। সুতরাং, যে ঈমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম ও কিয়াম আদায় করবে, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন সে মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়েছিলো। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ১৬৬০, মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হাদীস: ৭৭৮৭, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস: ২২০১]

রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত 💜-

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, " সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, রোযাদারদের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুরভির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।[সহীহ বুখারী,হাদীস;১৯০৪ ; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১১৫১]

উল্লেখ্য, এই হাদীসে দুর্গন্ধ দ্বারা পানাহার বর্জনের কারনে স্বাভাবিকভাবে যে গন্ধ হয় তা বোঝানো হয়েছে। দাঁত ও মুখের অপরিচ্ছন্নতাজনিত দুর্গন্ধ উদ্দেশ্য নয়। তাই রোযাদার অবশ্যই মিসওয়াক করবে এবং দাঁত ও মুখ পরিষ্কার রাখার বিষয়ে সচেতন থাকবে। এটি সব সময়ের কর্তব্য।

রোযাদারের জন্য দুনিয়াতে আনন্দ, পরকালেও আনন্দ💜-

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মূহুর্ত রয়েছে, এক. যখন সে তার রবের সঙ্গে মিলিত হবে, তখন রোযার কারনে আনন্দিত হবে।

অন্য বর্ণনায় আছে, যখন সে আল্লাহর সঙ্গেমিলিত হবে, আর তিনি তাকে রোযার পুরষ্কার দিবেন। তখন সে আনন্দিত হবে।[সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৯০৪, সহীহ মুসল্য,হাদীস; ১১৫১]

রোযাদারের দুআ নিশ্চিত কবুল হয় 💜-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ইফতারের সময় রোযাদারের একটি দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।(অর্থাৎ তা কবুল করা হয়) [সুনানে ইবনে মাজাহ,হাদীস:১৭৫৩]

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, " " "রোযাদারের দু'আ ফিরিয়ে দ
দেওয়া হয় না।"

রোযা হিংসা- বিদ্বেষ দূর করে 💜 -

হযরত আব্দুল্লকহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

সবরের মাস (রমযান) এর রোযা এবং প্রতি মাসের তিন দিন (আইয়্যামে বীয :১৩, ১৪, ১৫) -এর রোযা অন্তরের হিংসা - বিদ্বেষ দূর করে দেয়।

[মুসনাদে বাযযার, হাদীস:১০৫৭; ওয়াত তারহীব, হাদীস: ১৫৬৩]

ফযিলত পাওয়ার শর্ত 💜-

প্রকাশ থাকে যে, রোযার ফযিলতসমূহ লাভ করতে হলে এবং এর বরকত ও পুরষ্কারসমূহ পেতে হলে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অথা অত্নশুদ্ধি, ধৈর্য, তাকওয়া ও খোদাভীতি অর্জন করতে হলে শুধু পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ ত্যাগ করাই যথেষ্ট নয়। কারন এগুলো ত্যাগ করা হল রোযার দেহ।আর রোযার রূহ হল এসব জিনিষ ত্যাগ করার পাশাপাশি সব ধরনের গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকা। কেননা গুনাহ থেকে বিরত থাকা ব্যতীত রোযা আল্লাহ তায়ালার নিকট কোনো মূল্য রাখে না। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

রোযা হচ্ছে ঢাল। সুতরাং, রোযাদার কোনো অশ্লীল কথাবার্তা বলবে না এবং মূর্খতাসূলভ কোন কাজ করবে না। কেউ যদি তাকে গালি দেয় বা তার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে সে যেনো বলে! আমি রোযাদার।[সহীহ বুখারী,হাদীস:১৮৯৪]

অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

"যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় মিথ্যাচার ও মন্দকাজ ত্যাগ করে নি,তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।[সহীহ বুখারী ১/২১৫ হাদীস নং ;১৯০৩]

সুতরাং, অন্যান্য সময়ের মত রোযা অবস্থায়ও বিশেষ করে নিম্নোক্ত গুনাসমূহ পরত্যাগ করতে হবে। (১) হারাম সম্পদ দ্বারা সাহরী ও ইফতার করা। (২) গীবত বা পরনিন্দা করা। (৩) ঝগড়া - বিবাদ করা। (৪) ধোঁকা - প্রতারণা ও মিথ্যাচার আশ্রয় নেওয়া। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে যথাযথভাবে রোজা পালন ক:রার তাওফিক দান করুক।

■ রোযা সম্পর্কিত হাদীসসমূহঃ

১). হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবসহ রমজান মাসের সিয়াম পালন করবে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুণাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (সহীহ বুখারী: ৩৮, সহীহ মুসলিম: ৭৬০)

২)হযরত সাহল বিন সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন, জান্নাতের একটি দরজা আছে, একে রাইয়ান বলা হয়, এই দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন একমাত্র সায়িম ব্যক্তিই জান্নাত প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেউ এই পথে প্রবেশ করবে না। সেদিন এই বলে আহবান করা হবে সায়িমগণ কোথায়? তারা যেন এই পথে প্রবেশ করে। এভাবে সকল সায়িম ভেতরে প্রবেশ করার পর দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। অত:পর এ পথে আর কেউ প্রবেশ করেবে না। (সহীহ বুখারী: ১৮৯৬, সহীহ মুসলিম: ১১৫২)

৩)হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন, সিয়াম ঢালস্বরূপ। তোমাদের কেউ কোনোদিন সিয়াম পালন করলে তার মুখ থেকে যেন অশ্লীল কথা বের না হয়। কেউ যদি তাকে গালমন্দ করে অথবা ঝগড়ায় প্ররোচিত করতে চায় সে যেন বলে, আমি সায়িম। (সহীহ বুখারী: ১৮৯৪, সহীহ মুসলিম:১১৫১)

৪)হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, সিয়াম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব। (সহীহ বুখারী: ১৯০৪)

৫)হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন, তোমাদের নিকট রমজান মাস উপস্থিত। এটা এক অত্যন্ত বারাকতময় মাস। আল্লাহ তা'য়ালা এ মাসে তোমাদের প্রতি সাওম ফরজ করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যায়, এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এ মাসে বড় বড় শাইতানগুলোকে আটক রাখা হয়। আল্লাহর জন্যে এ মাসে

একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়েও অনেক উত্তম। যে লোক এ রাত্রির মহা কল্যাণলাভ হতে বঞ্চিত থাকল, সে সত্যিই বঞ্চিত ব্যক্তি। (সুনানুন নাসায়ী: ২১০৬)

৬) হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হাদিসে কুদসিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য— রোজা ব্যতীত। কারণ, রোজা আমার জন্যই এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।' (মহানবী সা. আরও বলেন) 'রোজা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোজাদার। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর শপথ! অবশ্যই রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের সুগন্ধের চেয়েও সুগন্ধময়। রোজাদারের জন্য রয়েছে দুটি খুশির মুহূর্ত আছে, যা তাকে আনন্দিত করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশি হয় এবং যখন সে তার পালনকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন রোজার বিনিময়ে আনন্দিত হবে।' (বুখারি, হাদিস: ১৯০৪)

৭) হজরত হুজায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমার বুকে হেলান দিয়ে ছিলেন। তখন তিনি বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একদিন রোজা রাখার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কিছু সদকা করার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, সেও জান্নাত প্রবেশ করবে।' (মুসনাদে আহমাদ, সহিহ্ তারগিব, হাদিস: ৯৭২

৮)হজরত হুজায়ফা (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে ঘটিত বিভিন্ন ফেতনা ও গুনাহর কাফফারা হলো নামাজ, রোজা ও সদকা।' (বুখারি, হাদিস: ১৮৯৫)

৯)হজরত সাহল ইবনে সাআদ (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) এরশাদ করেন, 'জান্নাতের এক প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন ওই প্রবেশদ্বার দিয়ে রোজাদারগণ প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউই ও দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। বলা হবে, 'কোথায় রোজাদারগণ?' সুতরাং তারা ওই দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। এর পর যখন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ

করা হবে। ফলে তা দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করতে পারবে না।' (বুখারি, হাদিস: ১৮৯৬)

১০)হজরত আবু সাইদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে বান্দা আল্লাহর পথে একদিন মাত্র রোজা রাখবে, সেই বান্দাকে আল্লাহ বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের পথ পরিমাণ দূরত্বে রাখবেন।' (বুখারি, হাদিস: ২৮৪০)

১১)হজরত উসমান বিন আবুল আস থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) এরশাদ করেন, 'রোজা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ; যেমন যুদ্ধের সময় নিজেকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের ঢাল থাকে।' (মুসনাদে আহমাদ, সহিহুল জামিউস সাগির, হাদিস: ৩৮৭৯)

১২)হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, 'কিয়ামতের দিন রোজা ও কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি তাকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।' কোরআন বলবে, 'আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।' মহানবী (সা.) আরও বলেন, 'অতএব উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।' (মুসনাদে আহমাদ, সহিহ তারগিব, হাদিস: ৯৬৯)

১৩)হজরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন কোনো আমলের আজ্ঞা করুন; যার বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন।' (অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'যার মাধ্যমে আমি জান্নাত যেতে পারব') তিনি বললেন, 'তুমি রোজা রাখো। কারণ, এর সমতুল্য কিছু নেই।' পুনরায় আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন।' তিনি পুনরায় একই কথা বললেন, 'তুমি রোজা রাখো। কারণ, এর সমতুল্য কিছু নেই।' (নাসায়ি, সহিহ্ তারগিব, হাদিস: ৯৭৩)

■ রোজা রাখার উপকারিতাঃ

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে রোজা পালনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের

আগের লোকদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকওয়া, পরহেজগারি অর্জন করতে পারো।' (সুরা বাকারা : আয়াত ১৮৩)

রমজান মাসে রোজা পালন আল্লাহর তাআলা হুকুম। বিশেষ অক্ষমতা কিংবা অপারগতা ছাড়া রোজা ছেড়ে দিলে গুনাহ হবে। হাদিসে পাকে এসেছে-

'বিশেষ কোনো ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি রমজানের একটি রোজাও ভেঙে ফেলে, সে সারা জীবনও যদি রোজা রাখে তবুও রমজানের ওই রোজার হক আদায় হবে না। সে আল্লাহর সামনে এমনভাবে হাজির হবে যে, আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করবেন বা শাস্তি দেবেন।' (তাবারানি)

অন্য হাদিসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোনো কারণ ছাড়া রমজানের একদিন রোজা ভাঙে, সারা বছরেও তার কাজা হবে না হবে না, যদিও সে পুরো বছর রোজা পালন করে।' (হাদিসটি বুখারির টিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, আবু দাউদ, তিরিমজি, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

রমজানের রোজা পালনে রয়েছে অনেক উপকারিতা। হাদিসের নির্দেশনা এমন যে, 'রোজা রাখুন, সুস্থ থাকুন।'

রোজাদার ব্যক্তির জন্য দিনের বেলায় পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকতে হয়। যারা আল্লাহর এ নির্দেশ পালন করে তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ সওয়াব ও প্রতিদানের ঘোষণা-

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বান্দার সব নেক আমলের সওয়াব দানের জন্য একটি নিয়ম থাকে। নেক আমল অনুযায়ী সওয়াব দেওয়া হয়। তা দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু রোজার বিষয়টি সাধারণ নিয়মের উর্ধ্বে। বান্দা আমার জন্যই পানাহার ত্যাগ করেছে, যৌন ক্রিয়া থেকে বিরত থেকেছে। সুতরাং আমি নিজে তাকে বিশেষ প্রতিদান ও সওয়াব দেব।' (মুসলিম)

রোজা রাখলে আগের জীবনের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হাদসে এসেছে-

২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখবে, আল্লাহ তাআলা তার আগের (জীবনের) সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।' (বুখারি)

হাদিসে রোজাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার দুর্গ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদিসে পাকে এসেছে-

৩. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'রোযা হলো জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার শক্ত ঢাল এবং সুরক্ষিত বিশেষ দুর্গ।' (তিরমিজি)

এ রোজাই কেয়ামতের দিন রোজাদারের জন্য শাফায়াতকারী হবে। রোজা বলবে, হে আল্লাহ! আমার জন্য এ বান্দা পানাহার ত্যাগ ও জৈবিক চাহিদা পূরণ করেনি। সুতরাং এ বান্দাকে ক্ষমা করে দাও হে প্রভু! তখন আল্লাহ তাআলা রোজাদারের সুপারিশ গ্রহণ করে নেবেন।

রোজা রাখলে শরীরের যেসব উপকার হয়ঃ

হার্টের স্বাস্থ্য: রোজা হার্টের স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং হার্টের ঝুঁকি কমায়।

মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা: রোজার মাধ্যমে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ: রোজা ডায়াবেটিসের নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং ইনসুলিন প্রস্তুতি বাড়ায়।

কিডনির স্বাস্থ্য: রোজা কিডনির পরিচালনা উন্নত করে এবং শরীরের বর্জ্য পদার্থ নির্যাতন করে।

পরিপাকপ্রক্রিয়া উন্নতি: রোজা পরিপাকপ্রক্রিয়া উন্নত করে এবং খাবারের প্রস্তুতি সুষ্ঠু হয়।

ওজন নিয়ন্ত্রণ: রোজা ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং শরীরে চর্বি প্রস্তুতি কমায়।

অপকারের অভ্যাস থেকে মুক্তি: ধূমপান এবং অন্যান্য নেশাজাতীয় অভ্যাস থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় এবং সুস্থ জীবনের পথে প্রেরণা দেয়।

রোজা মানুষের জন্য পশুত্বের স্বভাব থেকে বিরত থাকার অন্যতম প্রশিক্ষণ। কেননা পশুর বৈশিষ্ট্য হলো, যখন ইচ্ছে খায়, ইচ্ছে হলেই পান করে কিংবা যৌণ কাজে জড়িয়ে পড়ে। আর ফেরেশতারা এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাদের না আছে পানাহারের চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা আর না আছে যৌন ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা। আর মানুষ রমজানে রোজা রাখার মাধ্যমে পশুত্বের সে স্বভাব থেকে ফিরে থেকে ফেরেশতাদের স্বভাবের অনুসরণ করার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও পরিমিতবোধ তৈরি করে থাকে।

রোজার সবচেয়ে বড় উপকারিতা হলো, তাকওয়া তথা মহান আল্লাহ তাআলা ভয় অর্জন করা। নিজেদের চরিত্রকে নিষ্কলুষ করে গড়ে তোলা। আল্লাহর হুকুম পালনে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হওয়া। শুধু তাই নয়, রোজা রাখার মাধ্যমে মানুষ কম খাওয়া, কম ঘুমানো ও কম কথা বলার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। আর তাতে মানুষের আত্মার অনেক উন্নতি হয় ও সৌন্দর্য বেড়ে যায়।

রোজা রেখে সতর্ক থাকতেও পরামর্শ দিয়েছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অন্য কারো মন্দ কথার জবাব না দিয়ে নিজেকে রোজাদার হিসেবে পরিচয় দেওয়ার মাধ্যমে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নসিহত পেশ করেছেন এভাবে-

'তোমাদের কেউ যখন রোজা রাখবে, তখন দিনের বেলা সে যেন মুখে কোনো অশ্লীল কথা না বলে, হৈ চৈ না করে। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসে কিংবা গালিগালাজ করে; তাহলে সে যেন শুধু এটুকু বলে চুপ থাকে যে, 'আমি রোজাদার', আমি রোজাদার।' (বুখারি)

কেননা রোজা রেখে মন্দ কথা ও মিথ্যা পরিহার না করতে পারলে এ রোজা মানুষের কোনো উপকারেই আসবে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

'রোজা রেখে যে ব্যক্তি মিথ্যা, মন্দকথা ও কুকর্ম ত্যাগ করে না, তার এই উপবাসে আল্লাহর কাছে কোনো কাজে আসে না।' (বুখারি)

অন্য হাদিসে এসেছে-

অনেক রোজাদার এমন আছে যে, মন্দ কাজ থেকে বিরত না থাকার কারণে তাদের রোজা থেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট ছাড়া কিছুই অর্জিত হয় না।' (মুসনাদে আহমাদ)

যেহেতু রোজা আল্লাহর নির্দেশ ও ফরজ ইবাদত। সুতরাং তা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ও সক্ষম মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য পালন করা আবশ্যক। আর যখন মানুষ রোজার বিধান পালন করে ছোট বড় সব গুনাহ থেকে বিরত থাকবে, তখনই রোজার সব সুফলগুলো পাওয়া যাবে।

পানাহার, স্ত্রী সহবাসসহ মিথ্যা, পরনিন্দা, গালিগালাজ, অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারলেই রোজার পরিপূর্ণ উপকারিতা লাভ করা সম্ভব হবে। আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে। ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য গুণ অর্জন করতে সক্ষম হবে মানুষ।

বিশেষ করে সেহরি ও ইফতার রোজার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমরা যদি এটিকে সুন্নত হিসেবে পালন করি তবে তা শুধু শারীরের পক্ষেই ভালো নয় বরং প্রভূত কল্যাণ

ও উপকারিতা পাওয়ার কারণও হয়ে থাকে। তাই সময় মতো সেহরি খাওয়া যেমন সুন্নত তেমনি সময় মতো ইফতার করাও সুন্নত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনই করতেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সেহরি খাও; কারণ এতে বরকত রয়েছে । আর খেজুর দিয়ে ইফতার করা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত।

বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণায় এসেছে, খেজুরে ভিটামিন এ, বি, সি এবং ডির পাশাপাশি ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং আরও অনেক দরকারী খনিজ রয়েছে যা শুধু হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, লিভার, পেট এবং স্নায়ুকেই মজবুত করে না, বরং শরীরে প্রচুর পরিমাণে শক্তিও সঞ্চার করে।

আবার গ্রীষ্মকালের রোজায় মানুষ তৃষ্ণার্ত বোধ করে, তাহলে প্রাচীন চিকিৎসকদের গবেষণা অনুসারে যদি কেউ সেহরির সময় ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দু'চামচ খাঁটি মধু পানির সঙ্গে মিশিয়ে পান করেন তাহলে সারা দিন সে প্রশান্ত থাকবে। পানির তৃষ্ণা কম হবে। কারণ মধুর মতো বরকতময় খাবার এবং চিকিৎসা মাল্টিভিটামিনের খনিজ হওয়ার কারণে এটি রোজার সময় শারীরিক শক্তি পুনরুদ্ধার করে থাকে।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে রোজার বিধান যথাযথ পালনের মাধ্যমে রোজা উপকারিতা ও তাকওয়া অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

■ রোজা রাখার ১৫টি ফজিলতঃ

রোজা রাখার অসংখ্য ফজিলত কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এখানে ১৫টি ফজিলত তুলে ধরা হলো-

১. রোজার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজে দেবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার ও কামাচার বর্জন করে । রোজা আমার জন্যই, আমি নিজেই এর পুরস্কার দেব । (বুখারি, হাদিস : ১৮৯৪)

২.আল্লাহ তাআলা নিজের ওপর অবধারিত করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য গ্রীষ্মকালে (রোজার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিন (কেয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন। (মুসনাদে বাযযার, হাদিস : ১০৩৯)

৩. কেয়ামতের দিন রোজাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোজাদার ব্যতিত অন্য কারো আগমন ঘটবে না। (মুসনাদে বাযযার, হাদিস : ৮১১৫)

৪. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোজা রাখবে, পরে তার মৃত্যু হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৩৩২৪)

৫. জান্নাতে একটি স্পেশাল ফটক রয়েছে। যার নাম রাইয়ান। সেই গেইট দিয়ে কেবল রোজাদারগণই প্রবেশ করতে পারবে । (বুখারি, হাদিস : ১৮৯৬)

৬. রোজাদারগণ রাইয়ান নামক গেইট দিয়ে প্রবেশ করে জান্নাতের পানীয় পান করবে। তারপর থেকে আর কখনো তাঁরা পিপাসার্ত হবে না। (তিরমিজি, হাদিস : ৭৬৫)

৭. রোজা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল। আল্লাহ তাআলা বলেন, রোজা হলো ঢাল। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৪৬৬৯)

৮. রোজা কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, অতঃপর তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৬৬২৬)

৯. ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখলে পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারি, হাদিস : ৩৮)

১০. ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখলে ও তারাবি পড়লে ওই দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন সে মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। (নাসাঈ, হাদিস : ২৫১৮)

১১. রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধময়। (বুখারি, হাদিস : ১৯০৪)

১২. রোজাদারের জন্য স্পেশাল দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে; এক. যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারের কারণে আনন্দ পায়। দুই. যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে তখন তার রোজার (পুরস্কার লাভের) কারণে আনন্দিত হবে। (বুখারি, হাদিস : ১৯০৪)

১৩. রোজাদারগণ পরকালে সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে। (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৩৪২৯)

১৪. ইফতারের সময় রোজাদার যদি দুআ করে, তাহলে তার দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। (অর্থাৎ তার দুআ কবুল হয়)। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৭৫৩)

১৫. রোজা অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৩০৭০)

- **রোজা কাদের উপর ফরজ:**

ইসলামের বিধান হলো- মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, স্থায়ী ও শারীরিক-মানসিকভাবে সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সিয়াম পালন বা রোজা রাখা ফরজ। যারা উল্লেখিত শর্তাবলির আওতাভুক্ত থাকবেন, তাদের অবশ্যই পবিত্র রমজান মাসের সিয়াম পালন করতে হবে। আর যাদের মধ্যে শর্তাবলি পাওয়া যাবে না, তাদের ওপর রমজানের রোজা রাখা ফরজ নয়। মুসলিম স্কলারদের ঐকমত্যে মোট দশ শ্রেণির মানুষের মধ্যে সিয়াম পালনের শর্ত অনুপস্থিত। তারা হলো-

(১) কাফের বা অমুসলিম : কারণ তারা ইবাদত করার যোগ্যতা রাখে না।

(২) অপ্রাপ্তবয়স্ক : অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সিয়াম পালন ফরজ নয়।

(৩) পাগল বা সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন নয় এমন ব্যক্তি : পাগল বলতে সাধারণত যার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, তাকে বুঝায়। যার মধ্যে ভালো-মন্দ পার্থক্য করার শক্তি থাকে না এমন ব্যক্তির জন্য সিয়াম পালন ফরজ নয়।

(৪) অতিশয় বৃদ্ধ : এমন বয়স্ক মানুষ যে ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে না। একজন মানুষের মাঝ থেকে যখন ভালো-মন্দ পার্থক্য করার অনুভূতি চলে যায়, তখন সে শিশুর মতোই।

(৫) যে সিয়াম পালনের সামর্থ্য রাখে না : রোগব্যাধি বা শারীরিকভাবে এমন অক্ষম ব্যক্তি, যার সিয়াম পালনের সামর্থ্য ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই- তাদের ওপরও রমজানের রোজা পালনের বিধান নেই। কারণ সে এই আমল-ইবাদত পালনের সামর্থ্য রাখে না।

(৬) মুসাফির : মুসাফির ব্যক্তির ওপর রমজানের সিয়াম পালন করা জায়েজ নয়। তবে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত- কোনোভাবেই সফরকে যেন সিয়াম পালন না করার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা না হয়।

(৭) যে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার আশা রাখে : যেসব রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ভবিষ্যতে বা পরবর্তী সময়ে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তার জন্য রমজানের রোজা পালন থেকে বিরত থাকার অনুমতি রয়েছে।

(৮) ঋতুমতী নারী : ঋতুকালীন নারীর জন্য সিয়াম পালন জায়েজ নয় বরং নিষেধ। পরবর্তী সময়ে ছুটে যাওয়া রোজাগুলোর কাজা করতে হবে।

(৯) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারী : যদি গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারী নারী রোজা রাখার কারণে তার নিজের বা সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা হয়; তবে সে সিয়াম ভঙ্গ করতে পারবে এবং পরে নিরাপদ সময়ে সে সিয়ামের কাজা আদায় করে নেবে।

(১০) অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে সিয়াম ভেঙে ফেলতে বাধ্য ব্যক্তি পরবর্তী সময়ে ওই রোজাটির কাজা আদায় করবে।

■ রোজার বিধানঃ

রাসূল (সা.) বলেন, রোজাদারের জন্য দুইটি আনন্দময় মুহূর্ত রয়েছে ১. ইফতারের সময় ২. আখারাতে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়'। (বুখারী ও মুসলিম)।

ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল ভিত্তির তৃতীয়টি হলো রোজা। ইসলামি বিধান অনুসারে- মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, স্থায়ী ও

শারীরিক-মানসিকভাবে সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সিয়াম পালন বা রোজা রাখা ফরজ।

রোজা শব্দের অর্থ হচ্ছে 'বিরত থাকা'। আর আরবিতে এর নাম সাওম, বহুবচনে সিয়াম। যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্ব প্রকার পানাহার, কামাচার, পাপাচার এবং সেই সঙ্গে যাবতীয় ভোগ-বিলাস ও অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকার নাম রোজা।

■ সফর অবস্থায় রোজা সংক্রান্ত বিধি-বিধানঃ

সফরকালে রোজা রাখতে সক্ষম-অক্ষম সবার জন্যই রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

রোজা বা সিয়াম ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল ভিত্তির মধ্যে তৃতীয়। সুবহে সাদেক বা ভোরের সূক্ষ আলো থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার, পাপাচার, কামাচার এবং যাবতীয় ভোগ-বিলাস থেকেও বিরত থাকার নাম রোজা।

একজন মুমিনের জন্য রমজান মাসের প্রস্তুতি গুরুত্বপূর্ণ।

রোজা প্রত্যেক সক্ষম মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজ করেছেন আল্লাহ।

তবে এ থেকে সাময়িকভাবে হলেও ছাড় দেওয়া হয়েছে রোগী ও মুসাফিরকে। অসুস্থতা যেমন সিয়াম পালন থেকে ছাড় পাওয়ার একটি কারণ তেমনি আরেক কারণ সফর।

সফর অবস্থায় রোজা সংক্রান্ত বিধি-বিধান:

সফরকালে রোজা রাখতে সক্ষম-অক্ষম সবার জন্যই রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

আল্লাহ তাআলা সফরে রোজা প্রসঙ্গে বলেন,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা সফরে থাকবে সে অন্য সময় পূরণ করে নেবে।" (সূরা বাকারা: ১৮৪)

সফর কষ্টদায়ক হোক বা আরামদায়ক হোক তাতে হুকুমের পরিবর্তন হবে না। মুসাফির ব্যক্তি যদি খাদেম সাথে নিয়ে ছায়ায় থাকে, পানি পথে বা আকাশ পথে সফর করে তার জন্যও রোজা ভঙ্গ করা এবং নামাজ কসর করা জায়েজ। যেহেতু পূর্বোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা অনুমতি দিয়েছেন।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

"আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অবকাশ দেয়া কাজগুলো কার্যকরী হওয়া পছন্দ করেন। যেমন তিনি তাঁর অবাধ্যতাকে অপছন্দ করেন।" [মুসনাদে আহমদ হা/৫৮৬৬]

হামযাহ্ ইবনে আমর আল আসলামি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, সফর অবস্থায় সিয়াম পালনের ক্ষমতা আমার রয়েছে। এ সময় সিয়াম পালন করলে আমার কোনো গুনাহ হবে কি?

তিনি বললেন,

هِى َرُخْصَةٌ ِمِن َاللَّه ِفَمَن ْأَخَذ َبِهَا فَحَسَنٌ ِوَمَن ْأَحَب َّأَن ْيَصُوم َ فَلا َجُنَاح َعَلَيْهِ

"এটা আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশেষ অবকাশ, যে তা গ্রহণ করবে, তা তার জন্য উত্তম। আর যদি কেউ সিয়াম পালন করতে চায়, তবে তার কোনো গুনাহ হবে না।" [সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫১৯]

আবুদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো এক সফরে প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে যাত্রা করলাম। গরম এত প্রচণ্ড ছিল যে, প্রত্যেকেই আপন আপন হাত মাথার উপর তুলে ধরেছিলেন। এ সময় নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ব্যতীত আমাদের কেউই সিয়াম রত ছিলেন না। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯৪৫)

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক সফরে ছিলেন, হঠাৎ তিনি লোকের জটলা এবং ছায়ার নিচে এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এর কী হয়েছে?

তারা বলল, সে রোজাদার। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لَيْس َمِن َالْبِر ِّالصِّيَام ُفِي السَّفَرِ

"সফরে সওম পালনে কোনো নেকির কাজ নয়।" [বুখারি, হাদিস নং ১৯৪৬]

– জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের বছর মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং সওম পালন করেই কুরাউল গামীম নামক উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছলেন। সাহাবীগণও সওম পালন করতে লাগলেন। তখন রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, সাহাবীদের জন্য সওম পালন করা কষ্ট দায়ক হয়ে পড়েছে। তখন তিনি আসরের পরে এক পেয়ালা পানি চাইলেন এবং তা পান করে ফেললেন। আর সাহাবীগণ (এ দৃশ্য) দেখছিলেন।

এরপর কিছু সাহাবি রোজা ভঙ্গ করে ফেললেন আর কিছু সাহাবি রোজা অব্যাহত রাখলেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কিছু সাহাবির রোজা পালনের ব্যাপারের খবর পৌছলে তিনি বললেন যে, أُولَئِك ُالْعُصَاة َأُولَئِك ُالْعُصَاةُ "এরাই অবাধ্য, এরাই অবাধ্য।" [মুসলিম হা/২৬৬৬, নাসায়ী, হাদিস নং ২২৬৩]

■ মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির রোজাঃ

জীবনযাপনের তাগিদেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে চলতে হয় আমাদের। হোক তা ব্যবসায়িক স্বার্থে কিংবা অন্য কোনো সৎ উদ্দেশে। পবিত্র রমজান মাসেও থেমে থাকে না আমাদের জীবনযাপন প্রক্রিয়ার এই গতি। কখনো কখনো এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি জমাতে হয়।

সফরকারী, ভ্রমণকারী, পর্যটক ইত্যাদি শব্দের ইসলামি পরিভাষা হলো: মুসাফির।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: 'আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সেই সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং কঠিন চান না।' (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৫)

এ-আয়াত প্রমাণ করে, মুসাফিরের জন্য রমজানের রোজা ভঙ্গের অনুমতি আছে। তাকে পরবর্তী সময়ে সে-পরিমাণ কাজা আদায় করতে হবে। তবে তিনি যদি রোজা রাখেন, তাহলে তার রোজা হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪০৩)

কোন ব্যক্তি সফরে থাকলে (মুসাফির) এবং অসুস্থ হলে, রোজা রাখলে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা এমতাবস্থায় রোজা ছাড়ার অনুমতি দিয়েছে ইসলাম। কিন্তু মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তিরা পরবর্তী সময় রোজা কাজা আদায় করবেন। অসুস্থ এবং মুসাফিরের জন্য রোজা রাখা বাধ্যতামূলক নয়। (সূরা বাকার:১৮৫)।

ইবনে কায়্যিম বলেন : সাহাবিগণ যখন সফরের সূচনা করতেন, গৃহ-প্রাঙ্গণ অতিক্রম ব্যতীতই পানাহার করে নিতেন। তারা একে রাসূল সা.-এর সুন্নত মনে করতেন। মুহাম্মাদ ইবনে কাব বলেন : আমি রমজানে আনাস ইবনে মালেকের নিকট আগমন করলে দেখতে পেলাম তিনি সফরে যাবার মনস্থ করেছেন,তার ঘোড়া প্রস্তুত রয়েছে,পরিধান করেছেন তিনি সফরের পোশাক। তিনি খাবারের নির্দেশ দিলেন এবং খাদ্য গ্রহণ করলেন, আমি বললাম : এটাই কি সুন্নত? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সুন্নত। অত:পর তিনি সফরে বের হলেন। (যাদুল মাআদ, ২/৫৫-৫৬)

তবে অগ্রগণ্য মত হলো : এই মত ব্যক্তিগতভাবে আনাস রা.-এর। সফরের সূচনা ব্যতীত কেউ রুখসত পালন করতে পারবে না। কারণ, রাসূল সা.-এর অসংখ্য সফরের কোথাও আমরা এর দৃষ্টান্ত পাই না। এবং কোরআনে এসেছে— তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ হবে,কিংবা সফরে থাকবে,ভিন্ন সময় রোজা রেখে নিবে। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৪)

সুতরাং যে সফরের সূচনা করে নি,সে সফরকারী হতে পারে না। অধিকাংশ আলেমের মতামত : সফরের সূচনা ব্যতীত পানাহার করা যাবে না। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/২০৬)

কখন মুসাফির বলে গণ্য হবে

সফরের দূরত্ব ৪৮ মাইল বা ৭২ কিলোমিটার। পূর্বেকার যুগে মানুষ পায়ে হেঁটে অথবা উটের পিঠে চড়ে স্বাভাবিক গতিতে চললে তিনদিনে ৭২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারত। তাই ৭২ কিলোমিটার পথ অতিক্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রাকারী মুসাফির হয়ে যায়।

এ ক্ষেত্রে হঠাৎ সফর করা এবং যারা সবসময় সফরে থাকে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। রুখসত সকলের ক্ষেত্রেই সমান। যেমন গাড়ী চালক সে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সব সময় সফরে থাকে। স্বভাবিকভাবেই সে সব সময় মুসাফির থাকবে এবং তার জন্য রোজা না রাখাই উত্তম। যখন সে মুকিম হবে তখন রোজা রাখবে। মুসাফির রোজার দিনে বাড়িতে ফিরে আসলে তাকে দিনের বাকি অংশ না খেয়ে থাকতে হবে এবং রোজা কাজা করবে।

মুসাফির হওয়ার মেয়াদ ১৫ দিনের কম। কোনো মুসাফির নিজ সফরে ১৫ দিনের বেশি একস্থানে থাকার নিয়ত করলে তাকে অন্যান্য মুকিমের মতো রোজা পালন করতে হবে এবং নামাজ পুরোই আদায় করতে হবে।

আর যদি ১৫ দিনের অথবা তার থেকে কম থাকার নিয়ত করে, অথবা কোনো কাজে বের হয়েছে কিন্তু জানে না কাজটি কবে শেষ হবে তার জন্য রোজা না রাখা ও নামাজ কসর করা জায়েয আছে, তাতে বছর পূর্ণ হোক না কেনো। কারণ তার পক্ষে সফরের বিধান এখনো বলবৎ রয়েছে । (শারহু উমদাতিল ফিকহ, ইবনে জিবরিন, সিয়াম অধ্যায়)

■ হায়েজ অবস্থায় নামাজ-রোজার বিধানঃ

হায়েজ, মাসিক বা ঋতুস্রাব নারীদেহের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। প্রতি মাসে সঠিক সময়ে মাসিক শুরু হওয়ার মাধ্যমে নারীর শারীরিক সুস্থতা ও সন্তান ধারণে সক্ষমতা

নিশ্চিত হয়। তা ছাড়া মাসিকচক্রের সঙ্গে যুক্ত আছে ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিধান। নিম্নে সে বিষয়ে কিছু মাসআলা তুলে ধরা হলো—

ঋতুস্রাবের সময়সীমা ও নামাজ-রোজার বিধান

ইসলামী শরিয়তের বিধান অনুযায়ী একজন নারীর ঋতুস্রাবের সর্বনিম্ন সময় তিন দিন আর সর্বোচ্চ সময় ১০ দিন।

তিন দিন থেকে ১০ দিন পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে মাসিক ঋতুস্রাবকালীন নামাজ-রোজা করার প্রয়োজন নেই। এই দিনগুলোতে নারীর যথাসাধ্য বিশ্রাম দরকার। এ জন্য এই দিনগুলোতে ইসলাম নারীকে নামাজ-রোজা থেকে দায়মুক্তি দিয়েছে।

কোনো কারণে ঋতুস্রাবের সময় ১০ দিনের চেয়ে বেড়ে গেলে নিজের আগের অভ্যাস অনুপাতে যে মেয়াদ আছে, ওই দিন পর্যন্ত বন্ধ রেখে এর পর থেকে নামাজ-রোজা পালন করবে।

- **ঋতুস্রাবকালে নারী**

হায়েজ,মাসিক বা ঋতুস্রাব নারীদেহের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। প্রতি মাসে সঠিক সময়ে মাসিক শুরু হওয়ার মাধ্যমে নারীর শারীরিক সুস্থতা ও সন্তান ধারণে সক্ষমতা নিশ্চিত হয়। তা ছাড়া মাসিকচক্রের সঙ্গে যুক্ত আছে ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিধান। নিম্নে সে বিষয়ে কিছু মাসআলা তুলে ধরা হলো—

ঋতুস্রাবের সময়সীমা ও নামাজ-রোজার বিধান

ইসলামী শরিয়তের বিধান অনুযায়ী একজন নারীর ঋতুস্রাবের সর্বনিম্ন সময় তিন দিন আর সর্বোচ্চ সময় ১০ দিন।

তিন দিন থেকে ১০ দিন পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে মাসিক ঋতুস্রাবকালীন নামাজ-রোজা করার প্রয়োজন নেই। এই দিনগুলোতে নারীর যথাসাধ্য বিশ্রাম দরকার। এ জন্য এই দিনগুলোতে ইসলাম নারীকে নামাজ-রোজা থেকে দায়মুক্তি দিয়েছে।

কোনো কারণে ঋতুস্রাবের সময় ১০ দিনের চেয়ে বেড়ে গেলে নিজের আগের অভ্যাস অনুপাতে যে মেয়াদ আছে, ওই দিন পর্যন্ত বন্ধ রেখে এর পর থেকে নামাজ-রোজা পালন করবে।

আর যদি ১০ দিনের ভেতরই শেষ হয়ে যায়, তাহলে রক্ত আসার শেষ দিন পর্যন্ত ঋতুস্রাব গণ্য করে নামাজ-রোজা ইত্যাদি বন্ধ রাখবে। এ অবস্থায় নামাজের কাজা না থাকলেও পরবর্তী সময়ে রোজা কাজা করে নেবে। (আদ্দুররুল মুখতার : ১/৩০০-৩০১)

ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রী সহবাস

ঋতুস্রাব অবস্থায় জেনেশুনে স্ত্রী সহবাস করা নিষিদ্ধ। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'লোকেরা আপনাকে হায়েজ তথা ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

আপনি বলে দিন, তা অপবিত্রতা। অতএব তোমরা হায়েজের সময় স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকো এবং তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়। ' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২২২)

হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো ঋতুবতীর সঙ্গে মিলিত হয় কিংবা কোনো নারীর পশ্চাদ্দ্বারে সঙ্গম করে অথবা কোনো গণকের কাছে যায়, নিশ্চয়ই সে মুহাম্মাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করে। ' (তিরমিজি, হাদিস : ১৩৫)

তা ছাড়া ডাক্তারদের মতেও এ সময় স্ত্রী সহবাস করা অনুচিত।

কারণ এ সময় স্রাবের রক্তের সঙ্গে বিভিন্ন রোগের জীবাণু বের হয়ে থাকে, যা সহবাসের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এ সময় সহবাস নিষিদ্ধ। তবে কেউ যদি তা করে ফেলে তার জন্য কর্তব্য হলো আল্লাহর কাছে তাওবা-ইস্তিগফারের পাশাপাশি সদকা করা। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'যে ব্যক্তি হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করে তার সম্পর্কে নবী (সা.) বলেছেন, সে যেন এক দিনার অথবা আধা দিনার (যা বর্তমান মূল্য হিসেবে ৪.৩৭৪ গ্রাম সমপরিমাণ স্বর্ণ) সদকা করে। ' (আবু দাউদ, হাদিস : ২৬৪)

ঋতুস্রাবকালীন আরো কিছু বিধান

ঋতুস্রাব চলাকালীন নারীরা কোরআন তিলাওয়াত করবে না এবং অন্যকে শেখানোর উদ্দেশ্যও পড়বে না। তবে একান্ত প্রয়োজন হলে পূর্ণ আয়াত তিলাওয়াত না করে এক বা দুই শব্দ করে কাউকে বলে দিতে পারবে এবং গোসল ফরজ থাকা অবস্থায়ও তাফসির পড়তে পারবে। তবে অজু করে পড়া ও ধরা মুস্তাহাব। (বাদায়েউস সানায়ে ১/১৫০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৯)

ঋতুস্রাবকালে কেউ যদি সিজদার আয়াত শুনে তাহলে তার ওপর সিজদা ওয়াজিব হবে না। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৪৩৪৭)

রমজানের রোজা, হজের কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কারণে নারীরা ওষুধ সেবনের মাধ্যমে সাময়িকভাবে স্রাব বন্ধ রাখে। ওষুধ সেবনের মাধ্যমে স্রাব বন্ধ রাখা বৈধ হলেও তা

ব্যবহারের আগে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। (মুসান্নাফে আবদুর রাজজাক, হাদিস : ১২১৯, ১২২০ আল-মুহিতুল বুরহানি ১/৩৯৯)

ঋতুস্রাবকালীন নারীরা আজানের জবাব দিতে পারবে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/২৯৩)

কেউ যদি হায়েজ অবস্থায় ইতিকাফ করে, তাহলে তার ইতিকাফ আদায় হবে না। এমনকি ইতিকাফের মাঝখানে হায়েজ চলে এলেও ইতিকাফ ভেঙে যাবে। (ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/২১)

■ রোজা অবস্থায় মহিলাদের মাসিক হলে করণীয়ঃ

রোজা অবস্থায় মহিলাদের মাসিক আরম্ভ হলে বা ঋতুস্রাব (হায়েজ) ও প্রসবোত্তর স্রাব (নিফাস) দেখা দিলে রোজা ভেঙে যাবে। তবে সক্ষম হলে ওই দিন রোজার সম্মানার্থে ইফতার পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকা ভালো। পরে এ রোজা কাজা আদায় করে নেবে। যারা উপযুক্ত ওজরের কারণে রোজা রাখতে পারবেন না, তারা রমজানের সম্মানার্থে অন্যদের সামনে পানাহার করবেন না। এটা তাকওয়ার পরিচায়ক। (সুরা হজ : ৩২)। অনুরূপভাবে রমজানে দিনের বেলায় মহিলাদের মাসিক বা ঋতুস্রাব বন্ধ হলে; সেই দিনের অবশিষ্ট সময় পানাহার থেকে বিরত থাকবে; এটি রোজার সম্মানে, রোজা হিসেবে নয়। এ দিনের রোজা আদায় করতে হবে। পরদিন থেকে রোজা পালন করবে। এমন অবস্থায় মহিলারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন, সবার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করতে পারবেন। রান্নাবান্না করা, দোয়া-দুরুদ পড়া, তাসবিহ তাহলিল এ সবই স্বাভাবিকভাবে করবেন এবং সাহরি ও ইফতারেও শরিক হতে পারবেন। (ফাতাওয়া আযিযি)।

■ অসুস্থ ব্যক্তির রোজার বিধানঃ

রোজা আল্লাহর ফরজ বিধান। ইসলামে মানুষের শক্তি, সামর্থ্য ও সাধ্যের বাইরে কোনো বিধান দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘আল্লাহ কারো ওপর এমন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত...।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৮৬)

অনেকে না জানার কারণে কঠিন অসুস্থ হয়েও রোজা রাখেন।

অথচ ইসলামী শরিয়ত তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছে। আবার অনেকে সামান্য অসুস্থতার অজুহাতে রোজা রাখতে চান না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ মেনে প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবন করে রোজা রাখা যায়। এখানে তা উল্লেখ করা হলো—
কোনো ধরনের ইনজেকশন, ইনসুলিন বা টিকা নিলে রোজা ভঙ্গ হয় না, এমনকি গ্লুকোজ ইনজেকশনের দ্বারাও রোজার কোনো ক্ষতি হয় না।
(ফাতাওয়ায়ে ওসমানি : ২/১৮৬)
রোজা অবস্থায় চোখে ড্রপ ব্যবহারের দ্বারা রোজার কোনো ক্ষতি হবে না, যদিও ওষুধের স্বাদ মুখে অনুভূত হয়। (ফাতাওয়া আলমগিরি : ১/২০৩)
কানে ড্রপ দিলে রোজা ভাঙে না। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে কান ও গলার মধ্যে সরাসরি কোনো সংযোগ নেই, যা পাকস্থলীতে নিয়ে যেতে পারে। এ বিষয়ে মুফতি রফি উসমানী (হাফিজাহুল্লাহ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুফতিরাতুস সাওম ফি মাজালিত তাদাওয়ি'তে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।
চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অভিমত সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। তাই এ কথা বলা যায় যে রোজা অবস্থায় কানের ড্রপ ব্যবহার করা যাবে। (মুফতিরাতুস সাওম ফি মাজালিত তাদাওয়ি)
দেহের অভ্যন্তরীণ রোগ-ব্যাধি নির্ণয় করার জন্য এনডোসকপি করা হয়। এ সময় গলা দিয়ে পেটের ভেতরে পাইপ প্রবেশ করানো হয়। যদি এই পাইপে তেল, পানি বা অন্য কোনো পদার্থ লাগানো থাকে, তাহলে রোজা ভেঙে যাবে।
আর যদি তেল বা কোনো পদার্থ লাগানো না থাকে, তাহলে এর দ্বারা রোজা ভাঙবে না। (রদ্দুল মুহতার : ৩/৩৬৯)
রোজা অবস্থায় কোনো ধরনের মেডিসিন ছাড়া অক্সিজেন গ্রহণ করলে রোজা ভাঙবে না। আর যদি অক্সিজেন কোনো ওষুধ মিশ্রিত থাকে, তাহলে রোজা ভেঙে যাবে। (জাদিদ ফেকহি মাসায়েল : ১/৮৮)
রোজার দুর্বলতা দূর করার লক্ষ্যে শরীরে স্যালাইন পুশ করা মাকরুহ। তবে রোগের কারণে শরীরে স্যালাইন নেওয়া যাবে। এতে রোজা ভাঙবে না। (আল ইসলাম ওয়া তিব্বুল হাদিস, পৃষ্ঠা ২৮৫)
রোজা অবস্থায় রক্ত দিলে বা নিলে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না। (ফাতহুল কাদির : ৪/৩২৭)

রোগের কারণে ডাক্তার যদি বলে, এ রোজার কারণে রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে বা সুস্থতা বিলম্বিত হতে পারে, তাহলে রোজা ভাঙা যায়। কিন্তু সামান্য অসুখ, যেমন— মাথাব্যথা, সর্দি, কাশি অনুরূপ কোনো সাধারণ রোগ-বালাইয়ের কারণে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ নয়। মনে রাখতে হবে, রোগের কারণে যেসব রোজা ভঙ্গ হয়, সেগুলো পরে একটির বদলে একটি করে কাজা করে নিতে হবে।

রোজা পালনে রোগ বৃদ্ধি পেলে পরহেজগারি মনে করে রোজা পালন করা অনুচিত। এ অবস্থায় রোজা ভঙ্গ করা জরুরি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা তোমাদের নিজেদের হত্যা কোরো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতিশয় দয়ালু।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ২৯)

অতিশয় বৃদ্ধের জন্য রোজা পালন জরুরি নয়। তবে ওই ব্যক্তি অন্য কাউকে দিয়ে কাজা আদায় করাবে বা ফিদিয়া দেবে। প্রতিটি রোজার জন্য একজন মিসকিনকে এক বেলা খাবার খাওয়াবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, '...শক্তিহীনদের কর্তব্য হচ্ছে ফিদিয়া দেওয়া, এটা একজন মিসকিনকে অন্নদান করা...।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৪)

মৃত্যুমুখী বৃদ্ধলোক অথবা এমন রোগে আক্রান্ত হলে, যা থেকে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, এমন অক্ষম ব্যক্তি প্রতিটি রোজার পরিবর্তে পৌনে দুই সের গম (ফিতরার পরিমাণ) অথবা তৎপরিমাণ মূল্য আদায় করবে। ইসলামের পরিভাষায় এটাকে ফিদিয়া বলা হয়। (জাওয়াহিরুল ফিকাহ : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯)

■ রোজা রাখার সওয়াব ও না রাখার শাস্তিঃ

যে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ইসলামের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে রোজা একটি। রমজান মাসে প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ও মুকিম তথা নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী প্রত্যেক মুসলমানের ওপর রোজা রাখা ফরজ। রোজার বিধান সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো' (সুরা বাকারা : ১৮৩)।

অন্য এক আয়াতে এসেছে, ‘অতএব, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে রোজা পালন করে। তবে কেউ রোগাক্রান্ত হলে অথবা সফরে থাকলে এ সংখ্যা অন্য সময়ে পূরণ করবে।’ (সুরা বাকারা : ১৮৫)

এই মাসে রোজা রাখলে যেমন অধিক সওয়াব লাভের সুযোগ রয়েছে, তদ্রুপ রোজা না রাখলেও রয়েছে ভয়াবহ শাস্তির আশঙ্কা। রমজান মাসে রোজা পরিত্যাগ করা কবিরা গুনাহ। রমজান মাসে রোজার প্রতিদান বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই দশগুণ থেকে সাতশগুণ বৃদ্ধি করা হয়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, কিন্তু রোজা ছাড়া। কেননা তা আমার জন্য, তাই আমি এর প্রতিদান দেব। সে আমার সন্তুষ্টির জন্য কামাচার ও পানাহার পরিত্যাগ করে। রোজা পালনকারীর জন্য রয়েছে দুটি সুসংবাদ যা তাকে খুশি করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশি হয় এবং যখন সে তার রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন রোজার বিনিময়ে আনন্দিত হবে। রোজা পালনকারীর মুখের (না খাওয়াজনিত) ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে মিসকের ঘ্রাণের চেয়েও উত্তম’ (বুখারি ১৯০৪)।

তিনি আরও বলেছেন, প্রত্যেক আমলেরই কাফফারা আছে। রোজা আমার জন্য, তাই আমি এর প্রতিদান দেব।’ (বুখারি ৭৫৩৮)

রোজার বিনিময়ে রয়েছে জান্নাত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমজান মাস ধৈর্যের মাস। আর ধৈর্যের প্রতিদান জান্নাত’ (ইবন খুজাইমা ১৮৮৭)। আরেক হাদিসে এসেছে, রোজা ঢালস্বরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত তা ভেঙে না ফেলে’ (নাসাঈ ২২৩৫, মুসনাদে আহমাদ ১৬৯০)।

এখানেই শেষ নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, রোজা পালনকারীর মুখের (না খাওয়াজনিত) ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে মিসকের ঘ্রাণের চেয়েও উত্তম’ (বুখারি ১৯০৪, সহিহ মুসলিম ১১৫১) ।

তিরমিজি শরিফে বর্ণনা করা হয়েছে, তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (তার মধ্যে একজন হলো) রোজা পালনকারী ব্যক্তি, যতক্ষণ না ইফতার করে।’ (তিরমিজি ৩৪৯৮)

এ তো গেল অধিক ফজিলতের বর্ণনা। রমজান মাসে রোজা না রাখার ভয়াবহ শাস্তির ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এ সময় দুজন লোক এসে আমার দুই বাহু ধরে আমাকে দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে যায়। অতঃপর আমাকে এমন কিছু লোকের কাছে নিয়ে যায়, যাদের পায়ের

টাখনুতে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের গাল ছিন্নভিন্ন, তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?' তারা বললেন, 'এরা এমন রোজাদার, যারা (অকারণে রমজান মাসের) রোজা শেষ না করেই ইফতার করত' (সহিহ ইবনে খুজাইমা, হাদিস : ১৫০৯)।

অপর হাদিসে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'যে ব্যক্তি প্রয়োজন ও রোগ ছাড়া রমজানের একটি রোজা ভেঙে ফেলল, তার সারা জীবনের রোজা দ্বারাও এ কাজা আদায় হবে না, যদিও সে সারা জীবন রোজা পালন করে' (তিরমিজি : ৭২৩)।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে রোজা রাখার তওফিক দান করুন।

■ যেসব কারণে রোজা ভেঙে যায়ঃ

নির্ধারিত কিছু শর্ত ও রোকন আদায়ের মাধ্যমে রোজা সম্পন্ন করতে হয়। এসব শর্ত ও রোকন পাওয়া না গেলে রোজা ভেঙে যায় এবং তা বাতিল বলে গণ্য হয়।

শরিয়ত অনুমোদিত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তির জন্য রোজা ভঙ্গ করা কবিরা গুনাহ। ইসলামী শরিয়তে রোজা ভঙ্গ করার প্রতিবিধান রাখলেও তার শতভাগ ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (শরিয়ত অনুমোদিত) কোনো কারণ ছাড়া বা রোগ ছাড়া রমজান মাসের একটি রোজা ভেঙে ফেলে, তার পুরো জীবনের রোজা দিয়েও এর ক্ষতিপূরণ হবে না। যদিও সে জীবনভর রোজা রাখে।(সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৭২৩)

■ রোজা ভঙ্গের কারনঃ

বিনা কারণে রোজা ভঙ্গ করলে তাকে অবশ্যই কাজা-কাফফারা উভয়ই আদায় করা ওয়াজিব। যতটি রোজা ভঙ্গ হবে, ততটি রোজা আদায় করতে হবে। কাজা রোজা একটির পরিবর্তে একটি অর্থাৎ রোজার কাজা হিসেবে শুধু একটি রোজাই যথেষ্ট। কাফফারা আদায় করার তিনটি বিধান রয়েছে।

একটি রোজা ভঙ্গের জন্য একাধারে ৬০টি রোজা রাখতে হবে। কাফফারা ধারাবাহিকভাবে ৬০টি রোজার মাঝে কোনো একটি ভঙ্গ হলে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।

যদি কারো জন্য ৬০টি রোজা পালন সম্ভব না হয় তবে ৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা খাওয়াতে হবে। কেউ অসুস্থতাজনিত কারণে রোজা রাখার ক্ষমতা না থাকলে ৬০ জন ফকির, মিসকিন, গরিব বা অসহায়কে প্রতিদিন দুই বেলা করে পেটভরে খাওয়াতে হবে। গোলাম বা দাসী আজাদ করে দিতে হবে।

■ **রোজা ভঙ্গের ১৫ কারণ:**

রোজা ভঙ্গের প্রধান তিন কারণ হলো—

১. কোনো কিছু খাওয়া। ২. কোনো কিছু পান করা। ৩. স্ত্রী সহবাস করা।

তবে এই তিনটির সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু সূক্ষ্ম কারণেও রোজা ভেঙে যায়, যা সাধারণত আমরা খেয়াল করি না।

যেমন ৪. ভুলে খাওয়া বা পান করার পর রোজা ভেঙে গেছে মনে করে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে খাওয়া বা পান করা। ৫. বিড়ি-সিগারেট বা হুঁকা সেবন করা। ৬. কাঁচা চাল, আটার খামির বা একত্রে অনেক লবণ খাওয়া। ৭. এমন কোনো বস্তু খাওয়া, যা সাধারণত খাওয়া হয় না। যেমন কাঠ, লোহা, কাগজ, পাথর, মাটি, কয়লা ইত্যাদি। ৮. পাথর, কাদামাটি, কংকর, তুলা-সুতা, তৃণলতা, খড়কুটো ও কাগজ গিলে ফেলা। ৯. নিজের থুতু হাতে নিয়ে গিলে ফেলা। ১০. ভুলে স্ত্রী সম্ভোগের পর রোজা ভেঙে গেছে মনে করে আবার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা। ১১. বৃষ্টি বা বরফের টুকরো খাদ্যনালির ভেতরে চলে গেলে রোজা ভেঙে যায়। ১২. দাঁত দিয়ে রক্ত বের হলে যদি তা থুতুর চেয়ে পরিমাণে বেশি হয় এবং কণ্ঠনালিতে চলে যায়। ১৩. মুখে পান দিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়া এবং এ অবস্থায় সুবহে সাদিক করা। ১৪. কাউকে জোরজবরদস্তি করে পানাহার করানো। ১৫. ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা বা বমি আসার পর তা গিলে ফেলা।

■ কোরআনে রোজা ভাঙার কারণঃ

যেসব কারণে রোজা ভেঙে যায় নির্ধারিত কিছু শর্ত ও রোকন আদায়ের মাধ্যমে রোজা সম্পন্ন করতে হয়। এসব শর্ত ও রোকন পাওয়া না গেলে রোজা ভেঙে যায় এবং তা বাতিল বলে গণ্য হয়।

শরিয়ত অনুমোদিত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তির জন্য রোজা ভঙ্গ করা কবিরা গুনাহ। ইসলামী শরিয়তে রোজা ভঙ্গ করার প্রতিবিধান রাখলেও তার শতভাগ ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (শরিয়ত অনুমোদিত) কোনো কারণ ছাড়া বা রোগ ছাড়া রমজান মাসের একটি রোজা ভেঙে ফেলে, তার

পুরো জীবনের রোজা দিয়েও এর ক্ষতিপূরণ হবে না। যদিও সে জীবনভর রোজা রাখে। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৭২৩)

কোরআনে রোজা ভাঙার কারণঃ

রোজা অবশ্য পালনীয় বিধান ও তা ভঙ্গ হওয়া বিষয়ে কোরআনের ঘোষণা হলো, 'রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।

আল্লাহ জানেন যে তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সঙ্গে সংগত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা করো। আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণরেখা থেকে ঊষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত আসা পর্যন্ত রোজা পূর্ণ কোরো। ' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৭)

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ রোজাদারকে তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেছেন— ক. স্ত্রী-সম্ভোগ, খ. খাবার গ্রহণ, গ. পানীয় গ্রহণ।

সুতরাং কেউ স্ত্রী-সম্ভোগ ও পানাহারে লিপ্ত হলে তার রোজা ভেঙে যাবে। এ ছাড়া আলেমরা এ বিষয়ে একমত যে 'হায়িজ' বা নারীদের ঋতুস্রাবের কারণেও রোজা ভেঙে যায়।

রোজা অবশ্য পালনীয় বিধান ও তা ভঙ্গ হওয়া বিষয়ে কোরআনের ঘোষণা হলো, 'রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।

■ রোজা ভাঙার প্রতিবিধানঃ

যেসব কারণে রোজা ভেঙে যায় প্রতিবিধানের বিচারে তা দুই প্রকার।

এক. যার কারণে রোজা ভেঙে যায় এবং তার প্রতিবিধান হিসেবে কাজা ও কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) উভয়টি আদায় করতে হয়। তা হলো স্ত্রী-সম্ভোগ ও ইচ্ছাকৃত পানাহার। কেউ যদি ইচ্ছা করে রমজান মাসের দিনের বেলা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে অথবা পানাহার করে, তবে তার রোজা ভেঙে যাবে। তার প্রতিবিধান হিসেবে ব্যক্তিকে রোজার কাজা ও কাফফারা করতে হবে। তবে ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ (রহ.)-এর মত হলো,

কেউ ইচ্ছা করে কিছু খেলে শুধু কাজা করবে। কাফফারা দিতে হবে না। তাদের মতে, শুধু স্ত্রী-সম্ভোগের কারণেই রোজার কাফফারা ওয়াজিব হয়।

উল্লেখ্য, ওষুধ ও ধূমপান পানাহারের অন্তর্ভুক্ত এবং স্বেচ্ছায় যেকোনো প্রকার বীর্যপাত স্ত্রী-সঙ্গমের অন্তর্ভুক্ত। কোনো স্বামী যদি স্ত্রীকে সহবাসে বাধ্য করে, তবে স্ত্রী শুধু রোজা কাজা করবে এবং স্বামীর কাজা-কাফফারা দুটোই করবে।

দুই. যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হলে প্রতিবিধান হিসেবে শুধু কাজা করতে হয়, কাফফারা দিতে হয় না। এমন কিছু কারণ হলো—

১. ইচ্ছা করে বমি করা,

২. বমির বেশির ভাগ মুখে আসার পর তা গিলে ফেলা,

৩. মেয়েদের মাসিক ও সন্তান প্রসবের পর ঋতুস্রাব,

৪. ইসলাম ত্যাগ করলে,

৫. গ্লুকোজ বা শক্তিবর্ধক ইনজেকশন বা সেলাইন দিলে,

৬. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় গলার ভেতর পানি প্রবেশ করলে,

৭. প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে ওষুধ বা অন্য কিছু শরীরে প্রবেশ করালে,

৮. রোজাদারকে জোর করে কেউ কিছু খাওয়ালে,

৯. রাত অবশিষ্ট আছে মনে করে সুবেহ সাদিকের পর পানাহার করলে,

১০. ইফতারের সময় হয়েছে ভেবে সূর্যাস্তের আগে ইফতার করলে,

১১. মুখ ভরে বমি করলে,

১২. ভুলবশত কোনো কিছু খেয়ে, রোজা ভেঙে গেছে ভেবে ইচ্ছা করে আরো কিছু খেলে,

১৩. বৃষ্টির পানি মুখে পড়ার পর তা খেয়ে ফেললে,

১৪. কান বা নাক দিয়ে ওষুধ প্রবেশ করালে,

১৫. জিহ্বা দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে ছোলা পরিমাণ কোনো কিছু বের করে খেয়ে ফেললে,

১৬. অল্প বমি মুখে আসার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা গিলে ফেললে,

১৭. রোজা স্মরণ থাকা অবস্থায় অজুতে কুলি বা নাকে পানি দেওয়ার সময় ভেতরে পানি চলে গেলে। (ফাতাওয়ায়ে শামি ও ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি)

■ রোজার কাজা ও কাফফারা কী?

রোজার কাজা হলো ভেঙে যাওয়া বা ভেঙে ফেলা রোজার প্রতিবিধান হিসেবে শুধু রোজা আদায় করা। অতিরিক্ত কিছু আদায় না করা। অন্যদিকে রোজার কাফফারা হলো প্রতিবিধান হিসেবে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করা। রোজার কাফফারা বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমার কী হয়েছে? সে বলল, আমি রোজা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, স্বাধীন করার মতো কোনো ক্রীতদাস তুমি মুক্ত করতে পারবে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি একাধারে দুই মাস সওম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। এরপর তিনি বললেন, ৬০ জন মিসকিন খাওয়াতে পারবে কি? সে বলল, না। হাদিস বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী (সা.) থেমে গেলেন, আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম। এ সময় নবী (সা.)-এর কাছে এক 'আরাক পেশ করা হলো, যাতে খেজুর ছিল। আরাক হলো ঝুড়ি। নবী (সা.) বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, এই যে আমি। তিনি বললেন, এগুলো নিয়ে দান করে দাও। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), আমার চেয়েও বেশি অভাবগ্রস্তকে সাদকা করব? আল্লাহর শপথ, মদিনার উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবারের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। রাসুল (সা.) হেসে উঠলেন এবং তার দাঁত দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেন, এগুলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও। ' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৯৩৬)

বেশির ভাগ ফকিহ বলেন, হাদিসে বর্ণিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক। অর্থাৎ রোজা ভঙ্গকারী দাস মুক্ত করতে অক্ষম হলে দুই মাস রোজা রাখবে। আর দুই মাস রোজা রাখতে ব্যর্থ হলে ৬০ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে।

কাফফারার পরিচয়ঃ

যে কাফফারা সম্পর্কে একটু পূর্বে আলোচনা হয়েছে তাহলো-

১. একজন মুসলমান কিংবা অমুসলমান গোলাম আযাদ করা।

২. বিরতিহীনভাবে দুমাস রোযা রাখা, এর মাঝে ঈদের দিন ও তাশরীকের দিনগুলো (অর্থাৎ কোরবানীর তিনদিন) থাকতে পারবে না। ৩. রোযাদার সাধারণতঃ যে খাবার খেয়ে থাকে তার মধ্যম ধরণের খাবার ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানো। এই ধারাবাহিকতা অনুসারে কাফফারা ওয়াজিব হয়। যে ব্যক্তি গোলাম আযাদ করার সামর্থ্য

রাখে না, সে অনবরত দু' মাস রোযা রাখবে। যদি তা না পারে তাহলে ষাটজন দরিদ্রকে খানা খাওয়াবে। প্রত্যেক দরিদ্রকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াবে। তবে মিসকীনদের মাঝে এমন কেউ থাকতে পারবে না যাদের ভরণ-পোষণ করা তার উপর ওয়াজিব। যেমন মাতা-পিতা, ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী। যদি মিসকীনদেরকে খাবারের পরিবর্তে শস্য দিতে চায় তাহলে প্রত্যেক মিসকীনকে আধা 'সা' গম, কিংবা আধা 'সা' গমের আটা, কিংবা আধা সা গমের মূল্য, কিংবা এক সা যব বা খেজুর, কিংবা এক সা যব অথবা এক সা খেজুরের মূল্য প্রদান করতে হবে।

বিঃ দ্রঃ'স': এক 'স' হল ৩ কেজি ২৬৪ গ্রাঃ, সোয়া তিন কেজির সামন্য বেশি

■ যেসকল কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়েযঃ

প্রশ্ন: রোযা ভঙ্গ করার গ্রহণযোগ্য কারণ সমূহ কি কি?

রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য কারণ সমূহ হল:

১) অসুস্থতা,

২) সফর। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, ْأو مَرِيضًا َكَان ْوَمَن َأُخَر ٍأَيَّام ْمِن ٌفَعِدَّة ٍسَفَر عَلَى "আর যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে (সে রোযা ভঙ্গ করে) অন্য দিনে তা কাযা আদায় করে নিবে।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৮৫)

৩) গর্ভবতী নারীর নিজের বা শিশুর জীবনের আশংকা করলে রোযা ভঙ্গ করবে।

৪) সন্তানকে দুগ্ধদানকারীনী নারী যদি রোযা রাখলে নিজের বা সন্তানের জীবনের আশংকা করে তবে রোযা ভঙ্গ করবে।

৫) কোন বিপদগ্রস্ত মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে রোযা ভঙ্গ করা: যেমন পানিতে ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার, আগুন থেকে বাঁচাতে গিয়ে দরকার হলে রোযা ভঙ্গ করা।

৬) আল্লাহ্র পথে জিহাদে থাকার সময় শরীরে শক্তি বজায় রাখার জন্য রোযা ভঙ্গ করা। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের সময় ছাহাবীদেরকে বলেছিলেন, ْإِنَّكُم مُصَبِّحُو ْعَدُوِّكُم ُوَالْفِطْر أَقْوَى ْلَكُم فَأَفْطِرُوا "আগামীকাল তোমরা শত্রুর মোকাবেলা করবে, রোযা ভঙ্গ করলে তোমরা অধিক শক্তিশালী থাকবে, তাই তোমরা রোযা ভঙ্গ কর।"

বৈধ কোন কারণে রোযা ভঙ্গ করলে দিনের বাকি অংশ রোযা অবস্থায় থাকা আবশ্যক নয়। কেননা সে তো গ্রহণযোগ্য ওযরের কারণেই রোযা ভঙ্গ করেছে। এজন্য এ মাসআলায় বিশুদ্ধ কথা হচ্ছেঃ কোন রোগী যদি অসুস্থতার কারণে দিনে রোযা ভঙ্গ

করে আর দিন শেষ হওয়ার আগেই সুস্থ হয়ে যায়, তবে দিনের বাকি অংশ রোযা অবস্থায় থাকার কোন আবশ্যকতা নেই। কোন মুসাফির যদি রোযা ভঙ্গ অবস্থায় দিন থাকতেই সফর থেকে ফিরে আসে তারও দিনের বাকি অংশ রোযা অবস্থায় থাকার আবশ্যকতা নেই। অনুরূপ বিধান ঋতুবতী নারীর। কেননা এরা সবাই বৈধ কারণে রোযা ভঙ্গ করেছে। তাই ঐ দিবস তাদের জন্যই। তাতে তাদের প্রতি ছিয়ামের আবশ্যকতা নেই। কেননা শরীয়ত তাদেরকে রোযা ভঙ্গের অনুমতি প্রদান করে আবার তা আবশ্যক করবে না।

এর বিপরীত মাসআলা হচ্ছে, রামাযান মাসের চাঁদ দেখা গেছে একথা যদি দিনের বেলায় প্রমাণিত হয়, তবে খবর পাওয়ার সাথে সাথে রোযার নিয়ত করে নিতে হবে এবং দিনের বাকী সময় রোযা অবস্থায় কাটাতে হবে। উভয় মাসআলায় পার্থক্য সুস্পষ্ট। কেননা যখন কিনা দিনের বেলায় রামাযান মাস শুরু হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়েছে, তখন তাদের উপর সে দিনের ছিয়াম পালন করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। কিন্তু না জানার কারণে তাদের ওযর গ্রহণযোগ্য এবং তাদের ছিয়াম বিশুদ্ধ। এই কারণে তারা যদি জানতে পারত যে আজ রামাযান শুরু হয়েছে, তবে রোযা রাখা তাদের জন্য আবশ্যক হত।

গ্রন্থঃ আল্লামা মুহাম্মদ বিন সালিহ আলা উসাইমিন রহ. প্রণিত ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম

■ রোযার নিয়ত করার সময়ঃ

নিয়ত করা ব্যতীত রোযা শুদ্ধ হবে না। নিয়ত করার ক্ষেত্র হলো অন্তর। রাত্র থেকে অর্ধ দিবসের কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত (যে কোন সময়) নিয়ত করলে রোযা সহী হয়ে যাবে। (এই বিধান নিম্নোক্ত রোযাসমূহের ক্ষেত্রে)

১. রমযানের রোযা ২. নির্দিষ্ট মানতের রোযা। ৩. নফল রোযা। শুধু রোযার নিয়ত দ্বারা, কিংবা নফল রোযার নিয়ত দ্বারাও রমযানের রোযা শুদ্ধ হবে। নির্দিষ্ট মানতের রোযা শুধু রোযার নিয়ত দ্বারা, তদ্রূপ নফল রোযার নিয়ত দ্বারা শুদ্ধ হবে। নফল রোযা শুধু রোযার নিয়ত দ্বারা, কিংবা নফল রোযার নিয়ত দ্বারা শুদ্ধ হয়ে যাবে। রোযার নিয়ত নির্দিষ্ট করা এবং রাত্র থেকে রোযার নিয়ত করা শর্ত। (নিম্নোক্ত রোযা সমূহের

ক্ষেত্রে) ১. রমযানের কাযা রোযার ক্ষেত্রে। ২. নফল রোযা নষ্ট করার পর তার কাযা আদায়ের ক্ষেত্রে। ৩. কাফ্ফারার রোযার ক্ষেত্রে। ৪. নির্দিষ্ট মানতের রোযার ক্ষেত্রে।

■ সেহরি খাওয়ার বিধানঃ

রোজা রাখার নিয়তে শেষ রাতে বরকত লাভের জন্য কিছু খাওয়াকে সেহরি বলা হয়। ইমাম তাবারানী (রহ.) বর্ণনা করেছেন রাসূল (সা.) বলেন, 'সেহরি গ্রহণকারীর খাবারের হিসাব হবে না'। তাছাড়া সেহরি খাওয়া রাসূল (সা.) এর একটি সুন্নত। রাসূল (সা.) এর হাদিস শরিফে সেহরি খাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। হজরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, 'তোমরা
সেহরি খাও, কেননা তাতে বরকত রয়েছে'। (বোখারী: ১৯২৩)।
রোজাদারের জন্য বরকতময় খাবার হলো সেহরি খাওয়া। সেহরি খাওয়া সুন্নত। কোনো কারণে সেহরি খেতে না পারলে সেহরি খাওয়া ছাড়াই রোজার নিয়ত করবেন। এতে রোজার ক্ষতি হবে না। অর্ধ রাতের পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যেকোনো সময়ে সেহরি খাওয়া হলে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। শেষ রাতে সেহরি খাওয়াই উত্তম। রাসূল (সা.) সাধারণত দেরি করে সেহরি খেতেন, তাই রাতের শেষ প্রহরে সেহরি খাওয়া সুন্নত। রাসূল (স.) বলেন, 'আমার উম্মত কল্যাণের সঙ্গে থাকবে যতদিন তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে এবং সেহরি দেরি করে করবে'। (আহমদ)।

■ সেহরির দু'আঃ

রোজার নিয়তকে অনেকে সেহরির দোয়া বলেন। যদিও সেহরির দোয়া বলতে কিছু নেই। রোজার জন্য নিয়ত করা আবশ্যক। মনের ইচ্ছা বা সংকল্পকে নিয়ত বলে। নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা জরুরি নয়। তাই কেউ মুখে নিয়ত না করলেও তার রোজাগুলো আদায় হয়ে যাবে। (আল-বাহরুর রায়েক: ২/৪৫২; আল-জাওহারুতুন নাইয়্যিরাহ: ১/১৭৬; রদ্দুল মুখতার: ৩/৩৩৯, ৩৪১; ফতোয়া হিন্দিয়া: ১/১৯৫)
রমজান মাসে সেহরি খাওয়াকেও অনেকে রোজার নিয়ত বলে গণ্য করেছেন। তবে সেহরি খাওয়ার সময় রোজা রাখার ইচ্ছা না থাকলে তা নিয়ত বলে গণ্য হবে না। (কিতাবুল ফিকাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৮১)

রমজানকে বলা দোয়া কবুলের মাস। রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, 'অবশ্যই আল্লাহ তাআলা রমজান মাসের প্রতিদিন ও রাতে অসংখ্য ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দার একটি করে দোয়া কবুল করেন।'
(মুসনাদে আহমদ: ৭৪৫০; মুসনাদে বাজ্জার: ৯৬২)

■ ইফতারের বিধানঃ

ইফতার শব্দের অর্থ ভঙ্গ করা বা ভেঙ্গে ফেলা। আমিমুল ইহসান (র.) বলেন, রোজাদারের জন্য ইফতার হলো তার পানাহার করা। শরীয়তের পরিভাষায় সারাদিন রোজা পালন শেষে সূর্যাস্ত হওয়ার পর পর পানি, শরবত, খেজুরসহ প্রয়োজনীয় খাবারের মাধ্যমে রোজা ভঙ্গ করাকে ইফতার বলা হয়। রাসূল (সা.) বলেন, রোজাদারের জন্য দুইটি আনন্দময় মুহূর্ত রয়েছে ১. ইফতারের সময় ২. আখারাতে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়'। (বুখারী ও মুসলিম)।
ইফতার খেজুর দিয়ে করা সুন্নত। আবু ইয়ালা (রহ.) বলেন, 'রাসূল (সা.) তিনটি খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। খেজুর ব্যতিত অন্যান্য ফলমূল দ্বারা ইফতার করা যাবে তবে খেজুর দ্বারা ইফতার করা ভালো। রাসূল (সা.) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ইফতার করে সে যেন খেজুর দিয়ে করে কেননা তা বরকতময়। যদি খেজুর না থাকে তবে পানি দিয়ে কেননা তা পবিত্র।দ (আবু দাউদ, ২৩৫৬ : পৃষ্ঠা)।
আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে পরকালের সফলতা ও জান্নাত লাভে রমজানের রোজার যথাযথ হক আদায় করে তা পালন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

■ ইফতারের দু'আঃ

দোয়া কবুলের মুহূর্তগুলোর মধ্যে ইফতারের সময়ও একটি। অনেকেই গল্প-গুজবের মধ্য দিয়ে ইফতার করে থাকেন। এটি সুন্নাহ পরিপন্থী। আবার ঘরের নারীরা এ সময় বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাদের উচিত, এ সময় দোয়া করা।
হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত- রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন—
তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না-

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক। ২. রোজাদার যতক্ষণ না ইফতার করে এবং ৩. মজলুমের। (ইবনে মাজা: ১৭৫২)

■ **ইফতারের পরের দোয়াঃ**

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (স.) যখন ইফতার করতেন, তখন বলতেন—

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَ ثَبَتَ الْأَجْرُ اِنْ شَاءَ اللهُ 'জাহাবাজ জামাউ; ওয়াবতাল্লাতিল উ'রুকু; ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ' অর্থ: '(ইফতারের মাধ্যমে) পিপাসা দূর হলো, শিরা-উপসিরা সিক্ত হলো এবং যদি আল্লাহ চান সাওয়াবও স্থির হলো।' (আবু দাউদ: ২৩৫৭)

■ লাইলাতুল কদরঃ

শবে কদরের দোয়া

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي

উচ্চারণ: আল্ল-হুম্মা ইন্নাকা আফুউন কারিম তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি।

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আপনি মহানুভব ক্ষমাশীল। আপনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।'

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে জানতে চেয়েছেন, 'আমি যদি জানতে পারি যে, কোন রাতটি লাইলাতুল কদর—তখন কোন দোয়া পড়বো?' তখন রাসুলুল্লাহ (স.) তাঁকে উপরোক্ত দোয়াটি পড়তে বলেন।

(সূত্র: তিরমিজি: ৩৫১৩)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে পবিত্র রমজানে কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী যতবেশি সম্ভব আমল করার এবং বেশি বেশি দোয়া করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

প্রস্তুতি কী আছে ফিরে আসা সেই মহান মাসের ? যে মাস পবিত্র কুরআন নাজিলের মাস, যে মাস গুনাহ মাফের মাস, যে মাস দুয়া কবুল করার মাস, যে মাস আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাস। যে মাস প্রতি বছর আসে পাপ-পঙ্কিলতায় জর্জরিত মানব জাতিকে সীমাহীন রহমতের ছায়ায় চির শান্তির আবাস জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিতে। যে মাস আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমত ও বরকতের প্লাবনের মাস। যে মাস মাগফিরাতের মাস। আরো রয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মহান আল্লাহর রমতের

উপহারের রজনী যাকে লাইলাতুল ক্বদর বলা হয়। যে রাতে কুরআনুল কারিম নাযিল হয়েছিল। আল্লাহপাক বলেন,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

লাইলাতুল কদর হল হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (সূরা কদর ৩)

◉ হজরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যাক্তি লাইলাতুল ক্বাদরে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদাত করে, তাঁর পিছনের সমস্ত গুনাহ মাপ করা হবে। আর যে ব্যাক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানে সিয়াম পালন করবে, তাঁরও অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে। (সহীহ বুখারি)

পরম করুণাময় রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালা এমন কোন বিধান মানুষের উপর চাপিয়ে দেননি যা মানুষের সাধ্যের বাহিরে। মানুষের উপযোগী করেই ইসলামের প্রতিটি বিধান তৈরী করা হয়েছে।যা পালন করা তেমন কষ্টকর বিষয় নয়। মহব্বত ও আন্তরিকতা থাকলেই অনায়াসে সমস্থ আদেশ পালন করা যায়। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে আল্লাহপাক ইসলামের বিধান পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংযোজন-বিয়োজন করে ইসলামকে সময়োপযোগী পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন।

❖ রমজান (رَمَضان) আরবি শব্দ 'রমজ' ধাতু থেকে এসেছে। 'রমজ' ধাতুর দুটি অর্থ আরবি অভিধান ও আরবি সাহিত্যে পাওয়া যায়। এর একটি অর্থ হলো দাহন বা পোড়ানো এবং অপরটি আরব দেশের বছরের প্রথম বৃষ্টি। অন্যদিকে সওম একটি আরবী শব্দ যার অর্থ বিরত থাকা বা আত্মসংযম করা। এটি আরবী সিয়াম শব্দের সমার্থক। এ মাসের নাম রমজান এ জন্য রাখা হয়েছে যে সর্বপ্রথম যখন এ মাসের নাম রাখা হয়েছিল তখন প্রচণ্ড গরম ছিল। এ জন্য এই মাসের নাম রাখা হয়েছে রমজান। এই পবিত্র মাসকে রমজান এ জন্য বলা হয়, এ মাসে আল্লাহপাক নিজ মেহেরবানিতে সব গুনাহ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেন; মানুষ যেন এক নব জীবন লাভ করতে পারে।শরীয়তের দৃষ্টিতে রমজান মাসে দিনের বেলা রোজা রাখার ফলে সারাদিন সকল প্রকার পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার কারণে মানুষের শরীরে এক প্রকার দাহ ও জ্বলনের সৃষ্টি হয়। সে গাত্রদাহ ও অন্তর্দাহকে সম্বল করে মহান আল্লাহ পাক বান্দার পিছনের পাপ রাশি তার গাত্রদাহের আগুনে জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দেন, ক্ষমা করে দেন। এ হচ্ছে রমজান মাসকে নামকরণের স্বার্থকতা। রমযান হল ইসলামিক বর্ষপঞ্জিকা অনুসারে নবম মাস, যে মাসে বিশ্বব্যাপী মুসলিমগণ ইসলামিক উপবাস সওম পালন

করে থাকে। রমজান মাসে রোজাপালন ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে তৃতীয়তম। রমজান মাস চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে ২৯ অথবা ত্রিশ দিনে হয়ে থাকে যা নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসের মাঝামাঝি সময়ে কেবলা পরিবর্তন হওয়ার দশ দিন পর পবিত্র রমজান মাসের রোজা ফরজ করা হয়েছে। এ মাসে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম ব্যক্তির উপর সওম পালন ফরয, কিন্তু অসুস্থ, গর্ভবতী, ঋতুবর্তী নারীদের ক্ষেত্রে তা শিথিল করা হয়েছে। রোজা বা সাওম হল সুবহে সাদিক থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার,পঞ্চইন্দ্রিয়ের দ্বারা গুনাহের কাজ এবং (স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে) যৌনসংগম থেকে বিরত থাকা। এ মাসে বিশ্বমুসলিমগণ অধিক ইবাদত করে থাকেন। কারণ অন্য মাসের তুলনায় এ মাসে ইবাদতের সওয়াব বহুগুণে বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

◉ রমজান /সওম প্রসংগে মহান আল্লাহ বলেন,

شَهْر رَمَضَان الَّذِي أُنزِل فِيه الْقُرْآن هُدًى لِّلنَّاس وَبَيِّنَات مِّن الْهُدَى وَالْفُرْقَان فَمَن شَهِد مِنكُم الشَّهْر فَلْيَصُمْه وَمَن كَان مَرِيضًا أَو عَلَى سَفَر فَعِدَّة مِّن أَيَّام أُخَر يُرِيد الله بِكُم الْيُسْر وَلا يُرِيد بِكُم الْعُسْر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّة وَلِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُون

রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (সূরা বাক্বারাহ ১৮৫)

◉ মহান আল্লাহপাক রোজা ফরয করা প্রসংগে আরো ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُم الصِّيَام كَمَا كُتِب عَلَى الَّذِين مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُون

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। (সূরা বাক্বারাহ ১৮৩)

■ হাদিস শরীফে আল্লার প্রিয় হাবীব ইরশাদ করেন

হজরত আবদুল্লাহ ইবনু্ ্‌ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা যখন চাঁদ দেখবে তখন সওম আরম্ভ করবে এবং যখন চাঁদ দেখবে তখন ইফতার করবে। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ রোযা পূর্ণ করবে। ইমাম ইসমাইল বুখারী (রঃ) উনার বিখ্যাত সহীহ বুখারীতে এই হাদিস শরীফটি উল্লেখ করেছেন।

◉ এছাড়াও ইসলামের ৫টি ভিত্তির মধ্যে ১টির অন্তর্ভুক্ত রোজা।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

হজরত উবায়দুল্লাহ্ ইবনু মূসা (রাঃ) ইবনু উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি।

১।আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান।

২। সালাত (নামাজ) কায়েম করা

৩। যাকাত দেওয়া

৪। হাজ্জ (হজ্জ) করা এবং

৫। রামাদান এর সিয়াম পালন করা। (সহীহ বুখারি/ঈমান)

◉ হজরত তালহা ইবনু্ ্‌ উবাদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত যে,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ". فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ " لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَصِيَامُ رَمَضَانَ ". قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ " لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ". قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ. قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ " لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ". قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ "

এলোমেল চুলসহ একজন গ্রাম্য আরব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট এলেন।

তারপর বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে বলুন, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর কত সালাত ফরজ করেছেন? তিনি বলেনঃ পাঁচ (ওয়াক্ত) সালাত, তবে তুমি যদি কিছু নফল আদায় কর তা স্বতন্ত্র কথা। এরপর তিনি বললেন, বলুন, আমার উপর কত সিয়াম আল্লাহ তা'আলা ফরজ করেছেন? রাসূল (ﷺ) বললেনঃ রমযান মাসের সওম, তবে তুমি যদি কিছু নফল কর তবে তা স্বতন্ত্র কথা। এরপর তিনি বললেন, বলুন, আল্লাহ আমার উপর কি পরিমান যাকাত ফরয করেছেন? রাবী বলেন, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইসলামের বিধান জানিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আল্লাহ আমার উপর যা ফরয করেছেন, আমি এর মাঝে কিছু বাড়াব না এবং কমাবও না। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সেও সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করল কিংবা বলেছেন, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাত লাভ করল।ইমাম বুখারী (রঃ) উনার বিখ্যাত সহীহ বুখারীতে এই মুল্যবান হাদিস শরীফটি উল্লেখ করেছেন।

◉ হজরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযান আরম্ভ হলে রহমতের দরাজাসমুহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমুহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়। (সহীহ মুসলিম)

◉ হজরত সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত,

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জান্নাতে রায়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাঁদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, সাওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তাঁরা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাঁদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে। (সহীহ বুখারি)

◉ হজরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুর্খের মত কাজ করবে না। যদি কেউ তাঁর সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাঁকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি সাওম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রানে, অবশ্যই সওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের গন্ধের চাইতেও

উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য আহার,পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরষ্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুন।

ইমাম ইসমাইল বুখারী (রঃ)উনার বিখ্যাত সহীহ বুখারীতে এই মুল্যবান হাদিস শরীফটি উল্লেখ করেছেন।

- **রমজানে যে ৭ আমল বেশি করতে হবেঃ**

ইবাদতের সবচেয়ে বড় মৌসুম হলো রমজান। এ মাসে প্রতিটি আমলের প্রতিদান যেমন হাজার গুণ বেড়ে যায়, তেমনি একজন মুমিনের জন্য সব পাপ থেকে বেঁচে নিজেকে একজন মুত্তাকি হিসাবে গড়ে তোলারও সুবর্ণ সুযোগ হয়।

সারা বছর আমাদের থেকে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, সেগুলোকে আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার মোক্ষম একটা সুযোগ হলো রমজান। এ মহাসৌভাগ্য অর্জন করতে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অনুসরণ করতে পারি।

পাপ কাজ বর্জন করুন

তবে রোজা রাখা মানে শুধু এই নয়, সুবহে সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম থেকে বিরত থাকা বরং পূর্ণাঙ্গভাবে রোজা রাখতে হলে এ সবের পাশাপাশি সব পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকাও বাঞ্ছনীয়। যেমন, মিথ্যা কথা বলা, অপরের দোষ চর্চা করা, ঝগড়া বিবাদ করা, গালাগালি করা, দৃষ্টির হেফাজত করা, সুদ, ঘুস ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকা।

পক্ষান্তরে যারা এসব কাজ থেকে বিরত থাকে না, হাদিসে সতর্ক করে বলা হয়েছে, তাদের রোজা আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত; রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পাপ, মিথ্যা কথা, অন্যায় কাজ ও মূর্খতাসুলভ কাজ ত্যাগ করতে পারে না, তার পানাহার ত্যাগ করাতে আল্লহতায়ালার কোনো প্রয়োজন নেই। (সহিহ বুখারি : ১৯০৩)।

কুরআন তেলাওয়াত করুন

রমজানে বেশি বেশি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। কেননা আল্লাহতায়ালা রমজানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, রমজান হলো এমন মাস, যে মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে। তাছাড়া রমজানে প্রতিটি আমলকে ৭০ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

আমরা যদি এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতে পারি, তাহলে ৭০ খতমের সওয়াব অনায়াসেই পেয়ে যাচ্ছি। তবে আমাদের এদিকে লক্ষ রাখতে হবে, অনেকে একাধিক খতম দেওয়ার জন্য খুব দ্রুত কুরআন তেলাওয়াত করেন। এটি একদমই সমীচীন নয়। বরং তেলাওয়াত ধীরে-সুস্থে কায়দাকানুন ঠিক রেখে করা উত্তম। তাই আমাদের উচিত, রমজানে সহিহ্-শুদ্ধভাবে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা এবং সময় থাকলে কুরআনের অর্থ বুঝে বুঝে তাফসিরসহ পড়াটা সর্বোত্তম কাজ।

নফল নামাজে মনোনিবেশ

রমজান সিয়ামের পাশাপাশি কিয়ামেরও মাস, অর্থাৎ নফল নামাজের মাস। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রমজানে (রাতের বেলা নফল) নামাজে দাঁড়িয়ে থাকে, ইমানের সঙ্গে ও সওয়াবের আশায় তার পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (সহিহ বুখারি : ৩৭)।

অন্য হাদিসে কিয়ামুল লাইল তথা রাতের নামাজের আদেশও দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তারাবির নামাজ আর এর চূড়ান্ত পর্যায় হলো তাহাজ্জুদের নামাজ। তাই আমাদের উচিত গুরুত্বের সঙ্গে রাতে তারাবির নামাজ আদায় করার পাশাপাশি তাহাজ্জুদের নামাজ এবং অন্যান্য নফল নামাজেও নিয়মিত হওয়া।

কায়মনে দোয়া করুন

রমজানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমলগুলোর অন্যতম আমল হলো বেশি বেশি দোয়া করা। কেননা হাদিসে বর্ণিত আছে, রমজানে সবচেয়ে বেশি দোয়া কবুল করা হয়। বিশেষ করে ইফতারের পূর্ব মুহূর্তের দোয়া। তখন নিজের গুনাহগুলোর জন্য ক্ষমা চেয়ে দোয়া করা কাম্য।

এ মাসে আল্লাহতায়ালা ক্ষমার দরজা উন্মুক্ত করে দেন। আল্লাহতায়াল বলেন, যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি তার গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তার পুরস্কার অনেক বাড়িয়ে দেবেন।

(সূরা তালাক : ৫)।

অন্যকে ইফতার করান

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে পানাহার করিয়ে ইফতার করাবে, সে তার অনুরূপ সওয়াব লাভ করবে। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৭৯০৬)।

অন্য রোজাদারকে ইফতার করানোর মাধ্যমে আমরা কিন্তু সহজেই একটি রোজার সওয়াব পেয়ে যাচ্ছি এবং আমরা যারা শহরে থাকি, আমাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ হলো, অনেক মানুষ ইফতারের সময় গাড়ি থেকে নেমে ভালোমন্দ ইফতার করতে পারেন না। আমরা যদি তাদের ইফতারে সহযোগিতা করতে পারি, তাহলেও আমরা মহাসৌভাগ্য অর্জন করতে পারব।

মুক্ত হস্তে দান করুন

আর রমজানে দানের গুরুত্ব অনেক বেশি। এ মাসকে দানের মাসও বলা হয়, কেননা এ মাসে একটি নফল ইবাদত করলে একটি ফরজের সমান সওয়াব। আর একটি ফরজ ইবাদত করলে ৭০টি ফরজের সওয়াব দেওয়া হয়। রমজানে নবি রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম এবং সালফে সালেহিনরা প্রচুর পরিমাণে দান করতেন।

আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.)-এর দান রমজানে এমনভাবে বেড়ে যেত, তা মুক্ত বাতাসের মতো হয়ে যেত। মুক্ত বাতাস যেভাবে সবার কাছে পৌঁছে, ঠিক তেমনি যে চাইত তাকে তিনি দান করতেন, যে চাইত না তাকেও তিনি দান করতেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল। আর রমজানে তাঁর বদান্যতা আরও বেড়ে যেত।

(সহিহ মুসলিম, ৩২০৮)।

তাই আমাদের উচিত দুস্থ-অভাবীদের সহযোগিতা করা।

■ বেশি বেশি জিকরঃ

রমজানে বেশি বেশি জিকির-আসকার করাও গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। অন্যান্য মাসের তুলনায় এ মাসে তূলনামূলক আমরা একটু অবসর থাকি বেশি। তাই অবসর সময়টুকু অপচয় না করে হাঁটতে-বসতে বেশি বেশি জিকির করা কাম্য।

রমজানে আমরা নিম্মোক্ত জিকিরগুলো আদায় করতে পারি। রাসূল (সা.) বলেন, সর্বোত্তম জিকির হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তাই আমাদের উচিত, এটা বেশি বেশি পড়া।

ক্ষমা চেয়ে এ জিকিরটি বেশি বেশি পড়া, রাব্বিগফিরলি ওয়া তুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রাহিম। অর্থাৎ : হে মহীয়ান রব! আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার

তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি অতিশয় তওবা কবুলকারী, দয়াবান অথবা সংক্ষেপে শুধু আস্তাগফিরুল্লাহও পড়তে পারেন।
এছাড়া 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহুম্মা সল্লিম সল্লিম', 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজিম' এ জিকিরগুলো আদায় করতে পারেন।

■ রমজান মাসের আমল ও দু'আঃ

রমাদান মাস আল্লাহ তা'আলা এক বিশেষ নিয়ামাত। সাওয়াব অর্জন করার মৌসুম। এ মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, রহমাত, বরকত ও নাজাতের মাস-রমাদান মাস। **আলকুরআনে এসেছে:** ''রমাদান মাস, যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে লোকদের পথ প্রদর্শক এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে'' [সূরা আলবাকারাহ : ১৮৫]
রমাদান মাসের ফযিলাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ''রমাদান- বরকতময় মাস তোমাদের দুয়ারে উপস্থিত হয়েছে। পুরো মাস রোযা পালন আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের দরজাগুলো। দুষ্ট শয়তানদের এ মাসে শৃংখলাবদ্ধ করে দেয়া হয়। এ মাসে আল্লাহ কর্তৃক একটি রাত প্রদত্ত হয়েছে, যা হাজার মাস থেকে উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল, সে বঞ্চিত হল (মহা কল্যাণ হতে)'' [সুনান আত-তিরমিযি: ৬৮৩]
এ মাসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল রয়েছে, যেগুলো পালন করার মাধ্যমে আমরা জান্নাতে যেতে পারি, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি। নিম্নে রমাদান মাসের আমল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

তবে এ আমলগুলো করার জন্য শর্ত হলো:

এক:-ইখলাস অর্থাৎ ''একনিষ্ঠতার সাথে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যে আমল করা। সুতরাং যে আমল হবে টাকা উপার্জনের জন্য, নেতৃত্ব অর্জনের জন্য ও সুনাম-খ্যাতি অর্জনের জন্যে সে আমলে ইখলাস থাকবে না অর্থাৎ এসব ইবাদাত বা নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে না বরং তা ছোট শির্কে রূপান্তরিত হতে পারে। **আল-কুরআনে এসেছে:** ''আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে,

তারা যেন আল্লাহর ‘ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে” [সূরা আল-বাইয়্যেনাহ : ৫]

দুই:- ইবাদাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ। সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সকল ইবাদাতের কথা উল্লেখ আছে সেগুলো পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো বাড়ানো বা কমানোর সুযোগ নেই। কারণ, ইবাদাত হচ্ছে তাই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন। **কুরআনে** এসেছে:‘এবং রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও’ [সূরা হাশর: ৭]

এ বিষয়ে **রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ‘‘যে এমন ইবাদত করল যাতে আমাদের কোন নির্দেশনা নেই তা পরিত্যাজ্য হিসাবে গণ্য হবে’’। [সহীহ মুসলিম : ৪৫৯০]

রমাদান মাসের গুরুত্বপূর্ণ আমলগুলো হলো

[১] সিয়াম পালন করা: ইসলামের পাঁচটি রুকনের একটি রুকন হল সিয়াম। আর রমাদান মাসে সিয়াম পালন করা ফরজ। সেজন্য রমাদান মাসের প্রধান আমল হলো সুন্নাহ মোতাবেক সিয়াম পালন করা। **মহান আল্লাহ** বলেন: “সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে, মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে” [সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৫]

সিয়াম পালনের ফযিলাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ইখলাস নিয়ে অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্য রমাদানে সিয়াম পালন করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে’’ [সহীহ বুখারী : ২০১৪]

‘‘যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় (অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্য) একদিন সিয়াম পালন করবে, তাদ্বারা আল্লাহ তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে সত্তর বছরের রাস্তা পরিমাণ দূরবর্তীস্থানে রাখবেন’’। [সহীহ মুসলিম : ২৭৬৭]

[২] সময় মত সালাত আদায় করা: সিয়াম পালনের সাথে সাথে সময় মত নামায আদায় করার মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম হয়। **কুরআন মাজীদে** বলা হয়েছে: ‘নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।’ [সূরা নিসা : ১০৩]

এ বিষয়ে **হাদীসে** এসেছে:আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! কোন আমল জান্নাতের অতি নিকটবর্তী? তিনি বললেন, সময় মত নামায আদায় করা। [সহীহ মুসলিম : ২৬৩]

[৩] সহীহভাবে কুরআন শেখা: রমাদান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ মাসের অন্যতম আমল হলো সহীহভাবে কুরআন শেখা। আর কুরআন শিক্ষা করা ফরয করা হয়েছে। কেননা **কুরআনে** বলা হয়েছে:''পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন'' [সূরা আলাক : ১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শেখার নির্দেশ দিয়ে বলেন:''তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তিলাওয়াত কর'' [মুসনাদ আলজামি : ৯৮৯০]

[৪] অপরকে কুরআন পড়া শেখানো: রমাদান মাস অপরকে কুরআন শেখানোর উত্তম সময়। এ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সাহাবীদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। এ বিষয়ে **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ''তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়'' [সহীহ আল-বুখারী : ৫০২৭]

'যে আল্লাহর কিতাব থেকে একটি আয়াত শিক্ষা দিবে, যত তিলাওয়াত হবে তার সাওয়াব সে পাবে' [সহীহ কুনুযুস সুন্নাহ আন-নবুবিয়্যাহ : ০৭]

[৫] সাহরী খাওয়া: সাহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে এবং সিয়াম পালনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। **হাদীসে** এসেছে: ''সাহরী হল বরকতময় খাবার। তাই কখনো সাহরী খাওয়া বাদ দিয়ো না। এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহরী খেয়ে নাও। কেননা সাহরীর খাবার গ্রহণকারীকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতারা স্মরণ করে থাকেন'' [মুসনাদ আহমাদ : ১১১০১, সহীহ]

[৬] সালাতুত তারাবীহ পড়া: সালাতুত তারাবীহ পড়া এ মাসের অন্যতম আমল। তারাবীহ পড়ার সময় তার হক আদায় করতে হবে। **হাদীসে** এসেছে: 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব হাসিলের আশায় রমাদানে কিয়ামু রমাদান (সালাতুত তারাবীহ) আদায় করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে' [সহীহ আল-বুখারী : ২০০৯]

তারাবীহ এর সালাত তার হক আদায় করে অর্থাৎ ধীরস্থীরভাবে আদায় করতে হবে। তারাবীহ জামায়াতের সাথে আদায় করা সুন্নাহ এর অন্তর্ভুক্ত। **হাদীসে** আছে: ''যে ব্যক্তি ইমামের সাথে প্রস্থান করা অবধি সালাত আদায় করবে (সালাতুত তারাবীহ) তাকে

পুরো রাত কিয়ামুল লাইলের সাওয়াব দান করা হবে'' [সুনান আবূ দাউদ : **১৩৭৭**, সহীহ]

[৭] বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা: এটি কুরআনের মাস। তাই এ মাসে অন্যতম কাজ হলো বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা। হাদীসে এসেছে, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ''যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকি প্রদান করা হয়। প্রতিটি নেকি দশটি নেকির সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ'' [সুনান আত-তিরমিযী: ২৯১০, সহীহ]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদান ব্যতীত কোন মাসে এত বেশি তিলাওয়াত করতেন না। **আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা** থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ''রমাদান ব্যতীত অন্য কোনো রাত্রিতে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করতে, কিংবা ভোর অবধি সালাতে কাটিয়ে দিতে অথবা পূর্ণ মাস রোযা পালন করে কাটিয়ে দিতে দেখি নি'' [সহীহ মুসলিম : ১৭৭৩]

[৮] শুকরিয়া আদায় করা: রমাদান মাস পাওয়া এক বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। সেজন্য আল্লাহ তা'আলার বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করা এবং আগামী রমাদান পাওয়ার জন্য তাওফীক কামনা করা। রমাদান সম্পর্কে **কুরআনে** বলা হয়েছে: ''আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর।'' [সূরা আলবাকারাহ : ১৮৫]

''আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, 'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আজাব বড় কঠিন'।'' [সূরা ইবরাহীম : ৭]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায় করে বলতেন অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য [সুনান আত-তিরমিযী : ২৭৩৮]

[৯] কল্যাণকর কাজ বেশি বেশি করা: এ মাসটিতে একটি ভাল কাজ অন্য মাসের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম। সেজন্য যথাসম্ভব বেশি বেশি ভাল কাজ করতে হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি**

ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ''এ মাসের প্রত্যেক রাতে একজন ঘোষণাকারী এ বলে আহবান করতে থাকে যে, হে কল্যাণের অনুসন্ধানকারী তুমি আরো অগ্রসর হও! হে অসৎ কাজের পথিক, তোমরা অন্যায় পথে চলা বন্ধ কর। (তুমি কি জান?) এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তায়ালা কত লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন'' [সুনান আত-তিরমিযী : ৬৮৪]

[১০] সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়া: রমাদান মাস ছাড়াও সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়ার মধ্যে বিরাট সাওয়াব এবং মর্যাদা রয়েছে। রমাদানের কারণে আরো বেশি ফজিলত রয়েছে। যেহেতু সাহরী খাওয়ার জন্য উঠতে হয় সেজন্য রমাদান মাসে সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করার বিশেষ সুযোগও রয়েছে। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ''ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল রাতের সালাত অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সালাত'' [সহীহ মুসলিম : ২৮১২]

[১১] বেশি বেশি দান-সদাকাহ করা: এ মাসে বেশি বেশি দান-সাদাকাহ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। ইয়াতীম, বিধবা ও গরীব মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ও বেশি বেশি দান খয়রাত করা। হিসাব করে এ মাসে যাকাত দেয়া উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসে বেশি বেশি দান খয়রাত করতেন। **আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু** থেকে বর্ণিত: ''রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল আর রমাদানে তাঁর এ দানশীলতা আরো বেড়ে যেত'' [সহীহ আল-বুখারী : ১৯০২]

[১২] উত্তম চরিত্র গঠনের অনুশীলন করা: রমাদান মাস নিজকে গঠনের মাস। এ মাসে এমন প্রশিক্ষণ নিতে হবে যার মাধ্যমে বাকি মাসগুলো এভাবেই পরিচালিত হয়। কাজেই এ সময় আমাদেরকে সুন্দর চরিত্র গঠনের অনুশীলন করতে হবে। **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ''তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোযা রাখে, সে যেন তখন অশস্নীল কাজ ও শোরগোল থেকে বিরত থাকে। রোযা রাখা অবস্থায় কেউ যদি তার সাথে গালাগালি ও মারামারি করতে আসে সে যেন বলে, আমি রোযাদার'' [সহীহ মুসলিম : ১১৫১]

[১৩] ই'তিকাফ করা: ই'তিকাফ অর্থ অবস্থান করা। অর্থাৎ মানুষদের থেকে পৃথক হয়ে সালাত, সিয়াম, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, ইসতিগফার ও অন্যান্য ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে একাকী কিছু সময় যাপন করা। এ ইবাদাতের এত মর্যাদা যে, প্রত্যেক রমাদানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদানের শেষ দশ

দিন নিজে এবং তাঁর সাহাবীগণ ই'তিকাফ করতেন। **আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু** থেকে বর্ণিত: ''প্রত্যেক রমাযানেই তিনি শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু জীবনের শেষ রমযানে তিনি ইতিকাফ করেছিলেন বিশ দিন'' । দশ দিন ই'তেকাফ করা সুন্নাত। [সহীহ আলবুখারী : ২০৪৪]

[১৪] দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করা: রমাদান মাস হচ্ছে দ্বীনের দাওয়াতের সর্বোত্তম মাস। আর মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকাও উত্তম কাজ। এজন্য এ মাসে মানুষকে দ্বীনের পথে নিয়ে আসার জন্য আলোচনা করা, কুরআন ও হাদীসের দারস প্রদান, বই বিতরণ, কুরআন বিতরণ ইত্যাদি কাজ বেশি বেশি করা। **আলকুরআনের** ঘোষণা : ''ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, নেক আমল করলো এবং ঘোষণা করলো, আমি একজন মুসলিম'' [সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৩৩]

হাদীসে এসেছে:''ভাল কাজের পথ প্রদর্শনকারী এ কাজ সম্পাদনকারী অনুরূপ সাওয়াব পাবে'' [সুনান আত-তিরমীযি : ২৬৭০]

[১৫] সামর্থ্য থাকলে উমরা পালন করা: এ মাসে একটি উমরা করলে একটি হাজ্জ আদায়ের সমান সাওয়াব হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ''রমাদান মাসে উমরা করা আমার সাথে হাজ্জ আদায় করার সমতুল্য'' [সহীহ আলবুখারী : ১৮৬৩]

[১৬] লাইলাতুল কদর তালাশ করা: রমাদান মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। **আল-কুরআনের** ঘোষণা: ''কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম'' [সূরা কদর : ৪]

হাদীসে **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ''যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াব পাওয়ার আশায় ইবাদাত করবে তাকে পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে'' [সহীহ আল-বুখারী : ৩৫]

এ রাত পাওয়াটা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। এক হাদীসে **আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা** বলেন: ''রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য সময়ের তুলনায় রমদানের শেষ দশ দিনে অধিক হারে পরিশ্রম করতেন'' [সহীহ মুসলিম : ১১৭৫]

লাইলাতুল কদরের দো'আ: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর নবী ! যদি আমি লাইলাতুল কদর পেয়ে যাই তবে কি বলব ? **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বললেন, বলবেঃ ''হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন, তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।'' [সুনান আত-তিরমিযী : ৩৫১৩]

[১৭] বেশি বেশি দো'আ ও কান্নাকাটি করা: দো'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এজন্য এ মাসে বেশি বেশি দো'আ করা ও আল্লাহর নিকট বেশি বেশি কান্নাকাটি করা। **হাদীসে** এসেছে: ''ইফতারের মূহূর্তে আল্লাহ রাববুল আলামীন বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। মুক্তির এ প্রক্রিয়াটি রমাদানের প্রতি রাতেই চলতে থাকে'' [আল জামিউস সাগীর : ৩৯৩৩]

অন্য **হাদীসে** এসেছে: ''রমযানের প্রতি দিবসে ও রাতে আল্লাহ তা'আলা অনেককে মুক্ত করে দেন। প্রতি রাতে ও দিবসে প্রতি মুসলিমের দো'আ কবূল করা হয়'' [সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ১০০২]

[১৮] ইফতার করা: সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা বিরাট ফজিলাতপূর্ণ আমল। কোন বিলম্ব না করা । **কেননা** হাদীসে এসেছে: ''যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করবে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে, খেজুর না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করবে। কেননা পানি হলো অধিক পবিত্র '' [সুনান আবু দাউদ : ২৩৫৭, সহীহ]

নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন : ''পিপাসা নিবারিত হল, শিরা উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহর ইচ্ছায় পুরস্কারও নির্ধারিত হল।'' [সুনান আবূ-দাউদ: ২৩৫৯, সহীহ]

অপর বর্ণনায় যে এসেছে- ''হে আল্লাহ! তোমার জন্য রোযা রেখেছি, আর তোমারই রিযিক দ্বারা ইফতার করছি।'' এর সনদ দুর্বল। আমাদের উচিত সহীহ হাদীসের উপর আমল করা। [সুনান আবু দাউদ :২৩৫৮]

[১৯] ইফতার করানো: অপরকে ইফতার করানো একটি বিরাট সাওয়াবের কাজ। প্রতিদিন কমপক্ষে একজনকে ইফতার করানোর চেষ্টা করা দরকার। কেননা **হাদীসে** এসেছে: ''যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে তার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে, তাদের উভয়ের সাওয়াব হতে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না'' [সুনান ইবন মাজাহ : ১৭৪৬, সহীহ]

[২০] তাওবাহ ও ইস্তেগফার করা: তাওবাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ ফিরে আসা, গুনাহের কাজ আর না করার সিদ্ধান্ত নেয়া। এ মাস তাওবাহ করার উত্তম সময়। আর তাওবাহ করলে আল্লাহ খুশী হন। **আল-কুরআনে** এসেছে: ''হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাটি তাওবা; আশা করা যায়, তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত'' [সূরা আত-তাহরীম : ৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ''হে মানবসকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর, আর আমি দিনে তাঁর নিকট একশত বারের বেশি তাওবাহ করে থাকি'' [সহীহ মুসলিম : ৭০৩৪]

তবে তাওবাহ ও ইস্তেগফারের জন্য উত্তম হচ্ছে, মন থেকে সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার পড়া, আর তা হচ্ছে ''হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া প্রকৃত এবাদতের যোগ্য কেউ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার গোলাম আর আমি সাধ্যমত তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকারের উপর অবিচল রয়েছি। আমার কৃত-কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমাকে যত নেয়ামত দিয়েছে সেগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করছি। যত অপরাধ করেছি সেগুলোও স্বীকার করছি। অত:এব, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ, তুমি ছাড়া ক্ষমা করার কেউ নেই।''

ফযিলাত: ''যে কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দিনের বেলা এই দু'আটি (সাইয়েদুল ইসতিগফার) পাঠ করবে ঐ দিন সন্ধ্যা হওয়ার আগে মৃত্যু বরণ করলে সে জান্নাতবাসী হবে এবং যে কেউ ইয়াকিনের সাথে রাত্রিতে পাঠ করবে ঐ রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাতবাসী হবে।'' [সহীহ আল-বুখারী : ৬৩০৬]

[২১] তাকওয়া অর্জন করা: তাকওয়া এমন একটি গুণ, যা বান্দাহকে আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় পাপকাজ থেকে বিরত রাখে এবং তাঁর আদেশ মানতে বাধ্য করে। আর রমাদান মাস তাকওয়া নামক গুণটি অর্জন করার এক বিশেষ মৌসুম। **কুরআনে** এসেছে: ''হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে করে তোমরা এর মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো'' [সূরা আলবাকারাহ : **১৮৩**] যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। [সূরা তালাক : ০২]

[২২] ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করা: ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করা। এটি একটি বিরাট সাওয়াবের কাজ। এ বিষয়ে **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: যে ব্যক্তি ফজর জামাআত আদায় করার পর সূর্য উদয় পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করবে, অতঃপর দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে, সে পরিপূর্ণ হাজ্জ ও উমারাহ করার প্রতিদান পাবে। [সুনান আত-তিরমিযী : ৫৮৬]

[২৩] ফিতরাহ দেয়া: এ মাসে সিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতি পূরণার্থে ফিতরাহ দেয়া আবশ্যক। **ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু** বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ঈদের সালাত আদায়ের পুর্বে ফিতরাহ আদায় করার আদেশ দিলেন। [সহীহ আল-বুখারী :১৫০৩]

[২৪] অপরকে খাদ্য খাওয়ানো: রমাদান মাসে লোকদের খাওয়ানো, বিশেষ করে সিয়াম পালনকারী গরীব, অসহায়কে খাদ্য খাওয়ানো বিরাট সাওয়াবের কাজ। **কুরআনে** এসেছে: তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। [সূরা আদ-দাহর: ৮]

এ বিষয়ে **হাদীসে** বলা হয়েছে: ''আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, একজন লোক এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলামে উত্তম কাজ কোনটি? তিনি বললেন, অন্যদেরকে খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া'' [সহীহ আল-বুখারী : ১২]

অপর বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে :''যে কোনো মুমিন কোনো ক্ষুধার্ত মুমিনকে খাওয়াবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। [বাইহাকী, শু'আবুল ইমান : ৩০৯৮, হাসান]

[২৫] আত্মীয়তার সম্পর্ক উন্নীত করা: আত্মীয়তার সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তা রক্ষা করাও একটি ইবাদাত। এ বিষয়ে **আল্লাহ তা'আলা** বলেন: ''আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আরও তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। [সূরা আন-নিসা: ১]

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন:''সালাম বিমিয়ের মাধ্যমে হলেও আত্নীয়তার সম্পর্ক তরতাজা রাখ।'' [সহীহ কুনুযুস সুন্নাহ আন-নবওয়িয়্যাহ : ১৩]

[২৬] কুরআন মুখস্থ বা হিফয করা: কুরআন হিফয করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজেই কুরআন হিফযের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি এ দায়িত্ব মূলত বান্দাদেরকে কুরআন হিফয করানোর মাধ্যমেই সম্পাদন করেন। **কুরআনে** এসেছে: ''নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাযতকারী'' [সূরা আল-হিজর: ৯]

যে যত বেশি অংশ হিফয করতে পারবে তা তার জন্য ততই উত্তম।আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে **রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেন: ''কুরআনের ধারক-বাহককে বলা হবে কুরআন পড়ে যাও, আর উপরে উঠতে থাক, ধীর-স্থিরভাবে তারতীলের সাথে পাঠ কর, যেমন দুনিয়াতে

তারতীলের সাথে পাঠ করতে। কেননা জান্নাতে তোমার অবস্থান সেখানেই হবে, যেখানে তোমার আয়াত পড়া শেষ হবে" [সুনান আত-তিরমিযী : ২৯১৪]

[২৭] আল্লাহর যিকর করা: এ বিষয়ে **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা চারটি বাক্যকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন, তাহলো যে ব্যক্তি পড়বে, তার জন্য দশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি পড়বে, তার জন্য বিশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি পড়বে, তার জন্য বিশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে পড়বে, তার জন্য ত্রিশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর ত্রিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়"। [মুসনাদ আহমাদ : **১১৩৪৫**]

[২৮] মিসওয়াক করা: মেসওয়াকের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। হাদীসে এসেছে: অর্থাৎ মেসওয়াক মুখের জন্য পবিত্রকারী, এবং রবের সন্তুষ্টি আনয়নকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখেও মেসওয়াক করতেন বলে বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। [সহীহ ইবন খুযাইমাহ : **১৩৫**]

[২৯] একজন অপরজনকে কুরআন শুনানো: রমাদান মাসে একজন অপরজনকে কুরআন শুনানো একটি উত্তম আমল। এটিকে দাওর বলা হয়। **ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু** থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে: জিবরাইল আলাইহিস সালাম রমাদানের প্রতি রাতে রমাদানের শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং রাসূল তাকে কুরআন শোনাতেন। [সহীহ আল-বুখারী : ১৯০২]

ইবনে হাজার রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন : জিবরাইল প্রতি বছর রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করে এক রমযান হতে অন্য রমযান অবধি যা নাযিল হয়েছে, তা শোনাতেন এবং শুনতেন। যে বছর রাসূলের অন্তর্ধান হয়, সে বছর তিনি দু বার শোনান ও শোনেন ।

[৩০] কুরআন বুঝা ও আমল করা: কুরআনের এ মাসে কুরআন বুঝা ও আমল করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। কুরআন অনুযায়ী নিজের জীবনকে গড়ে তোলা। এ বিষয়ে **কুরআনে** নির্দেশ দেয়া হয়েছে: 'তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর'।

[সূরা আল-আ'রাফ : ৩]

কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী আবদুল্লাহ **ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু** বলেন: ‘আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কুরআনের দশটি আয়াত শিক্ষা গ্রহণ করতাম, এরপর ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরবর্তী দশটি আয়াত শিক্ষা করতাম না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই দশ আয়াতের ইলম ও আমল শিখতাম’ [শরহে মুশকিলুল আছার : ১৪৫০]

যা করণীয় নয়:

রমাদান মাসের ফজিলত হাসিল করার জন্য এমন কিছু কাজ রয়েছে যা থেকে বিরত থাকা দরকার, সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

1. বিলম্বে ইফতার করা
2. সাহরী না খাওয়া
3. শেষের দশ দিন কেনা কাটায় ব্যস্ত থাকা
4. মিথ্যা বলা ও অন্যান্য পাপ কাজ করা
5. অপচয় ও অপব্যয় করা
6. তিলাওয়াতের হক আদায় না করে কুরআন খতম করা
7. জামা‘আতের সাথে ফরয সালাত আদায়ে অলসতা করা
8. বেশি বেশি খাওয়া
9. রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদাত করা
10. বেশি বেশি ঘুমানো
11. সংকট তৈরি করা জিনিস পত্রের দাম বৃদ্ধির জন্য
12. অশ্লীল ছবি, নাটক দেখা
13. বেহুদা কাজে রাত জাগরণ করা
14. বিদ‘আত করা
15. দুনিয়াবী ব্যস্ততায় মগ্ন থাকা

রমাদান মাস পাওয়ার মত সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে! আমরা যদি এ মাসের প্রতিটি আমল সুন্নাহ পদ্ধতিতে করতে পারি তবেই আমাদের রমাদান পাওয়া সার্থক হবে।কেননা **হাদীসে** এসেছে: “যে ব্যক্তি রমাদান মাস পেলো অথচ তার গুনাহ মাফ করাতে পারল না সে ধ্বংস হোক।” [শারহুস সুন্নাহ : ৬৮৯]

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে রমাদান মাসের ফজিলত হাসিল করার তাওফীক দিন। **আমীন!**

রমজান জুড়ে যে দোয়াগুলো বেশি বেশি পড়বেনঃ

ক্ষমার মহান বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে পবিত্র মাহে রমজান। মুসলমানদের জন্য রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস এটি। রোজা শুধু আল্লাহর জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেভাবে নিজের সঙ্গে রোজার সম্পর্ক ঘোষণা করেছেন একইভাবে সব ইবাদত-বন্দেগি থেকে রোজাকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন।

যেমন তিনি এক হাদিসে কুদসিতে বলেন, 'মানুষের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোজা এর ব্যতিক্রম, তা শুধু আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান দেব (মুসলিম - ২৭৬০)।'

এ হাদিস দ্বারা আমরা অনুধাবন করতে পারি, নেক আমলের মাঝে রোজা রাখার গুরুত্ব আল্লাহর কাছে কতটা বেশি।

তাই, সাহাবি আবু হুরাইরা (রা.) যখন বলেছিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে অতি উত্তম কোনো নেক আমলের নির্দেশ দিন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তুমি রোজা রাখো। কারণ এর সমমর্যাদার আর কোনো আমল নেই।' (নাসায়ি-২৫৩৪)

রোজার এত মর্যাদার কারণ কী, সেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভালো জানেন। তবে, আমরা যা দেখি তা হলো, রোজা এমন একটি আমল, যাতে লোকদেখানো ভাব থাকে না। এটি বান্দা ও আল্লাহর মধ্যকার একটি অতি গোপন বিষয়।

রোজা পালনসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-কে অনুসরণ করাই সব মুসলিমের কর্তব্য। এ মাসে প্রতিটি ইবাদতের প্রতিদান বহুগুণে বেড়ে যায়। রোজায় রাসুল (সা.) আমাদের অনেকগুলো দোয়া শিখিয়েছেন।

হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, ইফতারের সময় রোজাদারের জন্য এমন একটি দোয়া রয়েছে যা ফিরিয়ে দেয়া হয় না।

(ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৭৫৩; তাবরানি, হাদিস : ১২২৯-১২৩০/২; বায়হাকি, হাদিস : ৩৯০৫)

হাদিস অনুযায়ী এবং ইফতারের আগে রোজাদারদের দুর্বল অবস্থায় থাকার পরিপ্রেক্ষিতে ইফতারের আগে দোয়া করলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই রোজাদারের উচিত, সারাদিন রোজা অবস্থায় দোয়া করার সুযোগ হাত ছাড়া না করা। বিশেষ করে ইফতারের আগের সময়টিতে দোয়ার জন্য বেশি গুরুত্ব দেয়া। এ সময় রোজদার যা দোয়া করবেন তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ইফতারের আগমুহূর্তে বেশি বেশি ইস্তিগফার পড়া-

– اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ – اَلَّذِى لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ
لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লাহাল আজিম, আল্লাযি লা ইলাহা ইল্লাহু আল-হাইয়্যুল ক্বইয়্যুম, ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।

-اَلْحَمْدُ لله اَللّٰهُمَّ إنِّي أسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئٍ أن تَغْفِرَلِي

উচ্চারণ : আলহামদুলিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বিরাহমাতিকাল্লাতি ওয়াসিআত কুল্লা শাইয়িন আন তাগফিরলি।

অর্থ : সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে তোমার সর্ববেষ্টিত রহমতের উসিলায় প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। (ইবনে মাজাহ) রমজান জুড়ে বিশ্বনবির এ দোয়াগুলো বেশি বেশি করা জরুরি।

আরও একটি দোয়া হচ্ছে-

اَللّٰهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওউন, তুহিব্বুল আফওয়া, ফা’ফু আ’ন্নি।

সাইয়্যিদুল ইসতেগফারও পড়া যেতে পারে-

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ
مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ
وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাক্বতানি; ওয়া আনা আ’বদুকা ওয়া আনা আ’লা আ’হদিকা ওয়া ওয়া’দিকা মাসতাত্বা’তু, আউজুবিকা মিন শাররি মা সানা’তু আবুউলাকা বিনি’মাতিকা আলাইয়া; ওয়া আবুউ বিজামবি ফাগফিরলি ফা ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা।

অর্থ: হে আল্লাহ তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নিয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কারন তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না।

যে ব্যাক্তি দিনের (সকাল) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ ইস্তিগফার পড়বে আর সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে মারা যাবে, সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যাক্তি রাতের (প্রথম) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দু'আ পড়ে নেবে আর সে ভোর হওয়ার আগেই মারা যাবে সে জান্নাতী হবে। (বুখারী ৫৮৬৭)

নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা অনুযায়ী মুমিন মুসলমান বিশেষ চারটি আমল, জিকির ও দোয়া করার মাধ্যমে মাসটি ইবাদতে কাটাবে। রোজাদারের জন্য মাসটি ইবাদতের বসন্তকালে পরিণত হবে। আমল চারটির মধ্যে দুটি মহান আল্লাহর জন্য আর দুটি বান্দার জন্য। হাদিসে এসেছে-

হজরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'শাবান মাসের শেষ দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্য এ মর্মে বক্তব্য দেন যে-

'হে লোক সকল! অবশ্যই তোমাদের সামনে মহান মাস, বরকতময় মাস উপস্থিত। এ মাসে তোমরা ৪টি আমল বেশি বেশি আদায় করবে।

এর মধ্যে দুইটি কাজ আল্লাহর জন্য আর দুইটি কাজ তোমাদের নিজেদের জন্য।'

>> আল্লাহর জন্য ২ আমল

১. কালেমার সর্বোত্তম তাসবিহ-

لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করা।

২. আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ইসতেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাহলো-

এ কালেমা মানুষকে এক আল্লাহর স্বীকৃতি তথা তাওহিদের দিকে ধাবিত করে। মানুষ সবচেয়ে বড় অপরাধ শিরক থেকে মুক্ত রাখে। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ যুগে যুগে নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। আর আমাদের জন্য দিয়েঠেন মহাগ্রন্থ আল-কোরআন। তাই কোরআন নাজিলের মাসে মহান আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দিতেই একনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে বেশি বেশি কালেমার তাসবিহ পাঠ করা।

ইসতেগফার বেশি বেশি পড়ার করার কারণ

এ কারণেই কোরআন-সুন্নায় বেশি বেশি তাওবাহ ইসতেগফার করার ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কেননা গুনাহমুক্ত জীবনের অন্যতম উপায় হচ্ছে তাওবাহ ও ইসতেগফার করা।

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন-

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

'যে গুনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়।' (সুরা নিসা : আয়াত ১১০)
'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে এবং তুমি কখনও তাদের জন্য সাহায্যকারী পাবে না। কিন্তু যারা তওবাহ করে ও সংশোধন হয় তারা ব্যতিত।' (সুরা নিসা : আয়াত ১৪৫-১৪৬)

وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْن لَعَلَّكُم تُفْلِحُوْنَ

'হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' (সুরা নুর : আয়াত ৩১)
তাই তো আল্লাহ বলেন, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ইসতেগফার কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।' ইসতেগফারের কারণে আল্লাহ তাআলা অনেক কঠিন অবস্থা থেকে মানুষকে হেফাজত করবেন। তাহলো-

> দেশে যদি খড়া বা বিপর্যয় তৈরি হয় তবে- আকাশ থেকে মেঘ বর্ষণ করবেন। দেশ মরুভূমি হবে না। বরং সুন্দর পরিবেশ তৈরি হবে।

> নিজেদের আয় রোজগার বেড়ে যাবে। কখনো অভাব আসবে না।

> সন্তান-সন্তুতি না থাকলে আল্লাহ সন্তান-সন্তুতি দান করবেন।

> পরিবেশেকে সবুজময় করে দেবেন।

> পরিবেশকে সুন্দর করতে নদি-নালা প্রবাহিত করাবেন।

>> নিজেদের দুই আমল

৩. আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করা।

৪. জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি চাওয়া।

জান্নাত চাওয়ার কারণ

জান্নাত তো মুমিনের আসল ঠিকানা। যে ঠিকানায় বসবাসে মুমিন কখনো বৃদ্ধ হবে না। ব্যবহারের কোনো জিনিসপত্র পুরনো হবে না। যেখানে বিরাজমান থাকবে মধুমিশ্রিত নদী। মদের ফোয়ারা। যে মদ পানে দুনিয়ার মতো মাতাল হবে মানুষ। সেখানে শেষ হবে না মানুষে যৌবন। হাদিসে পাকে এ জান্নাত লাভের প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। হাদিসে এসেছে-
‘যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চায় না আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রাগান্বিত হন।’
তাই জান্নাত পেতে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি প্রার্থনা, আকুতি জানাতে হবে।

জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়ার কারণ

আল্লাহর কোনো বান্দা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে, এটা মহান আল্লাহ নিজেও পছন্দ করেন না। পরকালের চিরস্থায়ী জীবন যেন আল্লাহর ভয়াবহ আজাবে পরিণত না হয় সে জন্যই আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা চাইতে হবে। আর ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের মহান আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদিসটিতে ঘোষিত ৪টি আমলের যথাযথ বাস্তবায়নে এ দোয়াগুলো পড়া জরুরি।

যা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো-

> বেশি বেশি কালেমার এ তাসবিহ পড়াঃ لَا اِلَٰهَ اِلَّا الله

উচ্চারণ : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

বেশি বেশি তাওবা-ইসতেগফার করা। সাইয়্যেদুল ইসতেগফারসহ কয়েকটি তুলে ধরা হলো-

> أَستَغْفِرُ اللهَ

উচ্চারণ : 'আস্তাগফিরুল্লাহ।'

অর্থ : আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

নিয়ম : প্রতি ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সালাম ফেরানোর পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ইসতেগফারটি ৩ বার পড়তেন।' (মিশকাত)

> أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ : 'আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি।'

অর্থ : আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর দিকেই ফিরে আসছি।

নিয়ম : এ ইসতেগফারটি প্রতিদিন ৭০/১০০ বার পড়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন ৭০ বারের অধিক তাওবাহ ও ইসতেগফার করতেন।' (বুখারি)

> رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ (أَنْتَ) التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণ : 'রাব্বিগ্ ফিরলি ওয়া তুব আলাইয়্যা ইন্নাকা (আংতাত) তাওয়্যাবুর রাহিম।'

অর্থ : 'হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবাহ কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী করুণাময়।'

নিয়ম : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে বসে এক বৈঠকেই এই দোয়া ১০০ বার পড়েছেন।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিজি, মিশকাত)

> أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لا إِلَه إِلا هُوَ الْحَى الْقَيُّوم وَأَتُوب إِلَيْهِ
উচ্চারণ : 'আস্তাগফিরুল্লা হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কইয়্যুমু ওয়া আতুবু ইলায়হি।'

অর্থ : 'আমি ওই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, যিনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং তাঁর কাছেই (তাওবাহ করে) ফিরে আসি।'

নিয়ম : দিনের যে কোনো ইবাদত-বন্দেগি তথা ক্ষমা প্রার্থনার সময় এভাবে তাওবাহ-ইসতেগফার করা। হাদিসে এসেছে- এভাবে তাওবাহ-ইসতেগফার করলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন, যদিও সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নকারী হয়।' (আবু দাউদ, তিরমিজি, মিশকাত)

> সাইয়েদুল ইসতেগফার পড়া

اللَّهُم أَنْت رَبِّي لَا إِلَه إِلَّا أَنْت خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُك وَأَنَا عَلَى عَهْدِك وَوَعْدِك مَا اسْتَطَعْت أَعُوذ بِك مِن شَر مَا صَنَعْت أَبُوء لَك بِنِعْمَتِك عَلَي وَأَبُوء لَك بِذَنْبِي فَاغْفِر لِي فَإِنَّه لَا يَغْفِر الذُّنُوب إِلَّا أَنْت

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আংতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আংতা খালাক্বতানি ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহ্দিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাতু আউজুবিকা মিন শাররি মা সানাতু আবুউলাকা বিনিমাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুউলাকা বিজাম্বি ফাগ্ফিরলি ফা-ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আংতা।'

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই বান্দা আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নেয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গোনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারন তুমি ছাড়া কেউ গোনাহ ক্ষমা করতে পারবে না।'

নিয়ম : সকালে ও সন্ধ্যায় এ ইসতেগফার করা। ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর এ ইসতেগফার পড়তে ভুল না করা। কেননা হাদিসে এসেছে- যে ব্যক্তি এ ইসতেগফার সকালে পড়ে আর সন্ধ্যার আগে মারা যায় কিংবা সন্ধ্যায় পড়ে সকাল হওয়ার আগে মারা যায়, তবে সে জান্নাতে যাবে।' (বুখারি)

জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া

اَللَّهُم اَدْخِلْنَا الْجَنَّة وَ اَجِرْنَا مِن النَّار

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আদখিলনাল জান্নাতা ওয়া আঝিরনা মিনান নার।'

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও।'

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউজুবিকা মিনান নার।'

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার কাছে

জান্নাত চাই এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাই।'

বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ঘোষণা করেন-

'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা ৩ বার জান্নাতের আশা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করবে, জান্নাত-জাহান্নামও আল্লাহর কাছে ওই ব্যক্তির দোয়া কবুলে সুপারিশ করবে।

হে আল্লাহ! পুরো রমজান মাসজুড়ে উল্লেখিত বিশেষ চারটি আমল ও দোয়াগুলো যথাযথ পালনে আপনার তাওফিকের বিকল্প নেই। যে আমলগুলো করতে শাবান মাসের শেষ দিন বিশ্বনবি সাহাবায়ে কেরামকে নসিহত পেশ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে পুরো রমজান মাসজুড়ে রোজা পালন, ফরজ ও নফল নামাজ, জিকির-আজকারের পাশাপাশি বিশেষ ৪ আমল ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দোয়াগুলো যথাযথ আদায় করার তাওফিক দান করুন। রমজানের লাভের তাওফিক দান করুন। আমিন।

■ রোযায় দোয়া কবুলের সময়ঃ

রমজানে দোয়া কবুলের ৩ সময়

পবিত্র রমজান মাসে রয়েছে দোয়া কবুলের কয়েকটি বিশেষ সময়, সে সময়গুলোতে দোয়া করলে আল্লাহ বান্দার দোয়া ফেরত দেন না। এর মধ্যে অন্যতম সময় হলো রাতের শেষ প্রহর।

প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন- রাতের দুই তৃতীয়াংশের পর যে দোয়া করা হয়। অর্থাৎ রমজানের সেহেরির সময়ের দোয়া বেশি কবুল হয়।

সুরা আল আহযানের ২১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"

অন্য এক হাদিসে প্রিয় নবী (সা.) বলেন, আমাদের পালনকর্তা মহান আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছো, আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে আছো, আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করবো। কে আছো, আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো। এভাবে তিনি ফজরের ওয়াক্ত স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত আহ্বান করতে থাকেন। (বুখারি, মুসলিম)

রমজানের শেষ রাতগুলো আরও বেশি মর্যাদাপূর্ণ। এ সময়ের দোয়া আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না। সুতরাং আমাদের উচিত এই মোক্ষম সময় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করা।

ইফতারি সামনে নিয়ে রোজাদার ব্যক্তি দোয়া করলে আল্লাহ তা কবুল করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ ফেরত দেন না। ইফতারের সময় রোজাদারের দোয়া, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর দোয়া এবং জালিমের বিপক্ষে মজলুমের দোয়া। (মুসনাদে আহমদ)

রমজানে দোয়া কবুলের আরেকটি বিশেষ সময় হলো ফজরের পর। হযরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসুলকে (সা.) কোন সময় দ্রুত দোয়া কবুল হয় মর্মে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দেন, রাতের শেষ প্রহর এবং ফজরের পর। (সুনানে তিরমিযি: ৩৪৯৮)

রমজানে অধিকাংশ মানুষ এই সময়টা ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু এ সময় দোয়া কবুল করানো, ক্ষমা ও আল্লাহর অনুগ্রহ লুফে নেওয়ার সুবর্ণ সময়।

রমজানে দোয়া কবুলের আরেকটি বিশেষ সময় হলো ফজরের পর। হযরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসুলকে (সা.) কোন সময় দ্রুত দোয়া কবুল হয় মর্মে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দেন, রাতের শেষ প্রহর এবং ফজরের পর। (সুনানে তিরমিযি: ৩৪৯৮)

রমজানে অধিকাংশ মানুষ এই সময়টা ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু এ সময় দোয়া কবুল করানো, ক্ষমা ও আল্লাহর অনুগ্রহ লুফে নেওয়ার সুবর্ণ সময়।

রমজান মাসের বিশেষ দোয়াঃ

হজরত সালমান (রা.) বলেন, একবার নবী করিম (স.) শাবান মাসের শেষদিন ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি বলেন, 'তোমরা রমজান মাসে চারটি কাজ খুব বেশি করে করবে। দুটি কাজ দ্বারা তোমাদের প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে পারবে। আর দুটি কাজ না করে তোমাদের রক্ষা নেই। যে দুটি কাজ দ্বারা তোমরা প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে পারবে তা হলো- তোমরা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিতে থাকবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে। যে দুটি কাজ না করে তোমাদের রক্ষা নেই তা হলো- তোমরা জান্নাত প্রার্থনা করবে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করবে।' (সহিহ ইবনে খুজাইমা: ১৮৮৭)

উপরোক্ত হাদিসের ভিত্তিতে চারটি দোয়া হলো—

১) أشهد أن لا إله إلا الله 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থ: আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই।

২) أستغفر الله 'আস্তাগফিরুল্লাহ' অর্থ: আমি আল্লাহর কাছে মাফ চাই।

৩) أسألك الجنة 'আসআলুকাল জান্নাহ' অর্থ: আমি আল্লাহর কাছে জান্নাত চাই।

৪) أعوذ بك من النار 'আউজু বিকা মিনান নার' অর্থ: আমি তোমার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।

রমজানের যে সময়ে বিশেষভাবে দোয়া কবুল হয়ঃ

ক্ষমার মহান বার্তা নিয়ে সমহিমায় হাজির হয়েছে রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস পবিত্র মাহে রমজান। দেশের আকাশে দেখা মিলেছে মুমিনের হৃদয়ে প্রহর গোনা রমজানের একফালি চাঁদ। এ মাসে প্রতিটি ইবাদতের প্রতিদান যেমন বহুগুণে বেড়ে যায়। নিঃসন্দেহে বছরের শ্রেষ্ঠ মাস হচ্ছে মাহে রমজান। এ মাসটিতে আল্লাহ তার বান্দার আমল এবং দোয়ার মাধ্যমে তার ১১ মাসের সব ভুল-ক্রুটি তথা অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

রমজানে দোয়া কবুলের বিশেষ কিছু সময় থাকলেও সারা মাসজুড়েই চলে ক্ষমা এবং অনুগ্রহ দানের এক মহোৎসব। পুরো রমজান দোয়া ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে কাটানো উচিত। আসন্ন মাহে রমজানকে যথাযথভাবে দোয়া, ইস্তিগফার, কুরআন তেলাওয়াত এবং অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করার তাওফিক দান করুন।

রমজান মাসে রয়েছে দোয়া কবুলের কয়েকটি বিশেষ সময়, সে সময়গুলোতে দোয়া করলে আল্লাহ বান্দান দোয়া ফেরত দেন না। এর মধ্যে অন্যতম সময় হলো রাতের শেষ প্রহর। প্রিয় নবীকে (সা.) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল— কোন সময়ের দোয়া আল্লাহ

বেশি কবুল করেন? উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন, রাতের দুই তৃতীয়াংশের পর যে দোয়া করা হয়। অর্থাৎ রমজানের সেহেরির সময়ের দোয়া বেশি কবুল করেন।

সুরা আল আহযানের ২১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।'

অন্যদিকে, সহিহ হাদিস এর মাধ্যমে আমরা রাসুলের জীবনের আদর্শ সম্পর্কে জানতে পারি। নগদ ইসলামিক অ্যাপে 'ইসলামিক জীবন' ফিচারে আসুন পড়ি সহিহ হাদিস এবং আমল করি রাসুলের দেখানো পথে।

অন্য এক হাদিসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আমাদের পালনকর্তা মহান আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছো, আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে আছো, আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করবো। কে আছো আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। এভাবে তিনি ফজরের ওয়াক্ত স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত আহ্বান করতে থাকেন। (বুখারি, মুসলিম)

রমজানের শেষ রাতগুলো আরও বেশি মর্যাদাপূর্ণ। এ সময়ের দোয়া আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না। সুতরাং আমাদের উচিত দোয়া কবুলের এই মোক্ষম দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে অতিবাহিত করা।

দ্বিতীয়ত দোয়া কবুলের বিশেষ সময়ের মধ্যে আরেকটি সময় হলো সারা দিন রোজা রেখে ইফতারি সামনে নিয়ে ইফতারির আগমুহূর্তে রোজাদার ব্যক্তি যে দোয়া করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ ফেরত দেন না। ইফতারের সময় রোজাদারের দোয়া, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর দোয়া এবং জালিমের বিপক্ষে মাজলুমের দোয়া। (মুসনাদে আহমদ)

এজন্য আমাদের উচিত ইফতারের আগমুহূর্তে সকল কাজ থেকে ফারেগ হয়ে গোনাহ মাফ এবং আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়ায় মশগুল হওয়া। অনেক সময় দেখা যায়, ইফতারির আগমুহূর্তে হৈ-হুল্লোড়, কথা-বার্তা বলতে বলতে আজান হয়ে যায়। অথচ আমরা চাইলে এসময়ে আমাদের যাপিত জীবনের গুনাহগুলো ক্ষমা করিয়ে নিতে পারি। আমাদের উচিত বাহুল্য কথা ত্যাগ করে দোয়ার মধ্যে এ মূল্যবান সময় পার করা।

তৃতীয় রমজানে দোয়া কবুলের আরেকটি বিশেষ সময় হলো ফজরের পর। হযরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসুলকে (সা.) কোন সময় দ্রুত দোয়া কবুল হয় মর্মে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন, রাতের শেষ প্রহর এবং ফজরের পর। (সুনানে তিরমিযি: ৩৪৯৮)

রমজানে অধিকাংশ মানুষ এই সময়টা ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু এ সময় দোয়া কবুল করানো, ক্ষমা ও আল্লাহর অনুগ্রহ লুফে নেওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ।

এছাড়াও দোয়া কবুলের জন্য অন্যতম সময় লাইলাতুল ক্বদর। শুধু রমজান নয়, বরং সারা বছরের মধ্যে অন্যতম ফজিলতপূর্ণ রাত হলো লাইলাতুল ক্বদর। এ রাত দোয়া কবুলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ রাতে মাগরিব থেকে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত অসংখ্য মানুষকে ক্ষমার ঘোষণা দেওয়া হয়। অসংখ্য মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

■ মৃত ব্যক্তির কাজা রোজা নিয়ে ইসলামী বিধানঃ

রোজা রেখে কোনো ওজর বা অসুবিধার কারণে ভেঙে ফেললে তা পরে কাজা আদায় করতে হয়। কাজা হলো একটি রোজার পরিবর্তে একটি রোজা। কাজা রোজা যেকোনো সুবিধামতো সময়ে আদায় করা যায়, সব কাজা রোজা একত্রে আদায় করা জরুরি নয়। রোজা রেখে ওজর ছাড়া কোনোরূপ ধোঁকায় বা তাড়নায় তা ভঙ্গ করলে এর জন্য কাজা ও কাফফারা উভয় আদায় করতে হয়। কাফফারা তিনভাবে আদায় করা যায়। একটি গোলাম আজাদ করা বা দাস মুক্ত করা, ৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা ভালোভাবে তৃপ্তিসহকারে আহার করানো এবং ধারাবাহিকভাবে ৬০টি রোজা পালন করা।

কাজা রোজা হলো একটি রোজার পরিবর্তে একটি রোজা, আর কাফফারা হলো ৬০টি। এরূপ যে কয়টি রোজা রাখার পর ওজর ছাড়া ভাঙবে, ততটির প্রতিটির পরিবর্তে একটি করে কাজা এবং একই রমজান মাসের জন্য তার সঙ্গে যুক্ত হবে একটি কাফফারা। অর্থাৎ একটি রোজা যৌক্তিক কারণ ছাড়া ভাঙলে তার জন্য কাজা ও কাফফারা হবে ৬১টি রোজা, ২টি ভাঙলে হবে ৬২টি রোজা, ৩টি ভাঙলে হবে ৬৩টি রোজা। অনুরূপ ৩০টি ভাঙলে হবে ৯০টি রোজা।

কাফফারা ৬০টি রোজা একত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আদায় করতে হয়। কারও যদি কাজা, কাফফারাসহ মোট ৬১টি বা তারও বেশি হয়, তবে কমপক্ষে ৬১টি রোজা একটানা আদায় করতে হবে। কাফফারার রোজার মাঝে বিরতি হলে বা ভাঙলে আরেকটি কাফফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে। অর্থাৎ ৬১টি রোজা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিরতি হলে পুনরায় নতুন করে এক থেকে শুরু করে ৬১টি পূর্ণ করতে হবে। যে রোজাগুলো রাখা হলো, তা নফল হিসেবে পরিগণিত হবে। কোনো গ্রহণযোগ্য ওজর বা আপদের কারণে ভাঙতে হলে তা ক্ষমার্হ্য। নারীদের বিশেষ বিরতির সময় বাদ দিয়ে ধারাবাহিকভাবে আদায় করতে হবে।

শিশু নাবালেগ অবস্থায় (সাধারণত মেয়েদের ১১ বছরের পূর্বে এবং ছেলেদের ১৩ বছরের পূর্বে) রোজা রাখা ফরজ নয়, তবু তারা নিজেদের আগ্রহে ও বড়দের উৎসাহে রোজা রেখে থাকে। এমতাবস্থায় তারা যদি রোজা রেখে কখনো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেকোনোভাবে রোজা ভেঙে ফেলে, তাহলে তাদের এই রোজার কাজা বা কাফফারা কোনোটিই প্রয়োজন হবে না। তারপরও যদি তারা বড়দের সঙ্গে কাজা রোজা রাখতে শুরু করে এবং তা আবার ভেঙে ফেলে, তারও কাজা লাগবে না। (আল হিদায়া)।

ফিদইয়া, সদকাতুল ফিতর ও কাফফারা তাদের দেওয়া যাবে, যাদের জাকাত তথা ফরজ ও ওয়াজিব সদকা প্রদান করা যায়। যথা 'ফকির, মিসকিন, সদকা কর্মী, অনুরক্ত ব্যক্তি ও নওমুসলিম, ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহর পথে জিহাদরত ও বিপদগ্রস্ত বিদেশি মুসাফির।' (সুরা-৯ তওবা, আয়াত: ৬০)।

রোজা না রাখার শাস্তি সম্পর্কে হজরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, একটি সম্প্রদায় উল্টোভাবে ঝুলছে। তাদের গলাটি ফাড়া এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা? বলা হল, এরা ঐসব ব্যক্তি যারা বিনা কারণে রমজান মাসের সিয়াম ভঙ্গ করেছিল।' (সহিহ ইবনে খুজাইমা, হাদিস নং : ১৫০৯)

তাই রোজার প্রতি যত্নশীল হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। তবে রমজান মাসে অসুস্থ, অতিবৃদ্ধ, মুসাফির, গর্ভবতী নারীর জন্য রোজা না রেখে পরবর্তীতে রোজার কাজা, কাফফারা, ফিদইয়া ইত্যাদি বদলা ব্যবস্থা স্থির করে শরিয়তে সুনির্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থা রয়েছে। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৪-১৮৫)

কিন্তু কেউ যদি রোজা না রেখে মারা যায় তাহলে অন্য কারো জন্য সেই মৃত ব্যক্তির রোজার কাজা বা কাফফারা আদায়ের কোনও বিধান নেই ইসলামে। তবে মৃত্যুকালে সে ব্যক্তি 'ফিদিয়া' দেওয়ার অসিয়ত করলে তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অসিয়ত পূর্ণ করা জরুরি। অসিয়ত না করলে ফিদিয়া দেওয়া জরুরি নয়। তবে তার প্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিশরা নিজ নিজ অংশ হতে তা আদায় করলে আদায় হওয়ার আশা করা যায়। (আদ্দুররুল মুখতার : ২/৪২৪, আল জাওহারাতুন নিয়ারাহ : ১/৪৪৩)

■ যে সকল ওযরের কারণে রোযা ভাঙ্গা বৈধঃ

ইসলাম স্বভাব ধর্ম। ইসলাম মানুষকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের আদেশ দেয় না। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। ফলে রোযা রাখার কারণে মানুষের কষ্ট হলে, কিংবা ক্ষতি হলে, রোযা ভাঙ্গার এবং অন্য সময় তা কাযা করার অনুমতি দিয়েছেন।

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে। যথা- ১. অসুস্থ ব্যক্তির জন্য। যদি রোযা তার ক্ষতি করে, কিংবা (রোযার কারণে) রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার বা রোগ দির্ঘায়িত হওয়ার আশংকা করে। ২. ঐ মুসাফিরের জন্য যে, দীর্ঘপথ ছফর করবে এবং তাতে নামায কছর করার বিধান রয়েছে। ৩. ঐ ব্যক্তির জন্য যার ভীষণ ক্ষুধা কিংবা প্রচন্ড পিপাসা লেগেছে এবং রোযা না ভাংলে প্রাণহানির প্রবল আশংকা করছে। ৪. গর্ভবতী মহিলার জন্য। যদি রোযা তার কিংবা তার গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি করে। ৫. স্তন্য দানকারিনী ধাত্রীর জন্য। যদি রোযা তার কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্ষতি করে। ৬. হায়য ও নেফাছগ্রস্ত মহিলার জন্য। বরং তাদের রোযা ভাঙ্গা ওয়াজিব। কারণ তাদের রোযা শুদ্ধ হবে না। ৭. রোযা রাখতে অক্ষম এমন অতিশয় বৃদ্ধের জন্য। বার্ধক্যের কারণে অতিশয় বৃদ্ধের রোযা কাযা করা লাগবে না, বরং তার ফিদয়া দিতে হবে। ৮. যে ব্যক্তি নফল রোযা রেখেছে তার জন্য বিনা ওজরে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে। তবে অন্য দিন সে রোযা আদায় করে নেয়া তার উপর ওয়াজিব। ৯. যে ব্যক্তি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধরত তার জন্য রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে। যার যিম্মায় কাযা রোযা রয়ে গেছে তার জন্য তাড়াতাড়ি কাযা আদায় করে নেওয়া মোস্তাহাব। অবশ্য কাযা আদায়ে বিলম্ব করাও জায়েয আছে। তদ্রূপ তার জন্য কাযা রোযাগুলো এক সঙ্গে রাখা কিংবা পৃথকভাবে রাখা উভয়টা জায়েয আছে। যদি কাযা আদায়ে এতো বিলম্ব করে যে, দ্বিতীয় রমযান

এসে গেছে তাহলে কাযা রোযার পূর্বে দ্বিতীয় রযমানের রোযা আদায় করে নিবে। কাযা আদায়ে বিলম্ব করায় ফিদয়া দেওয়া লাগবে না।